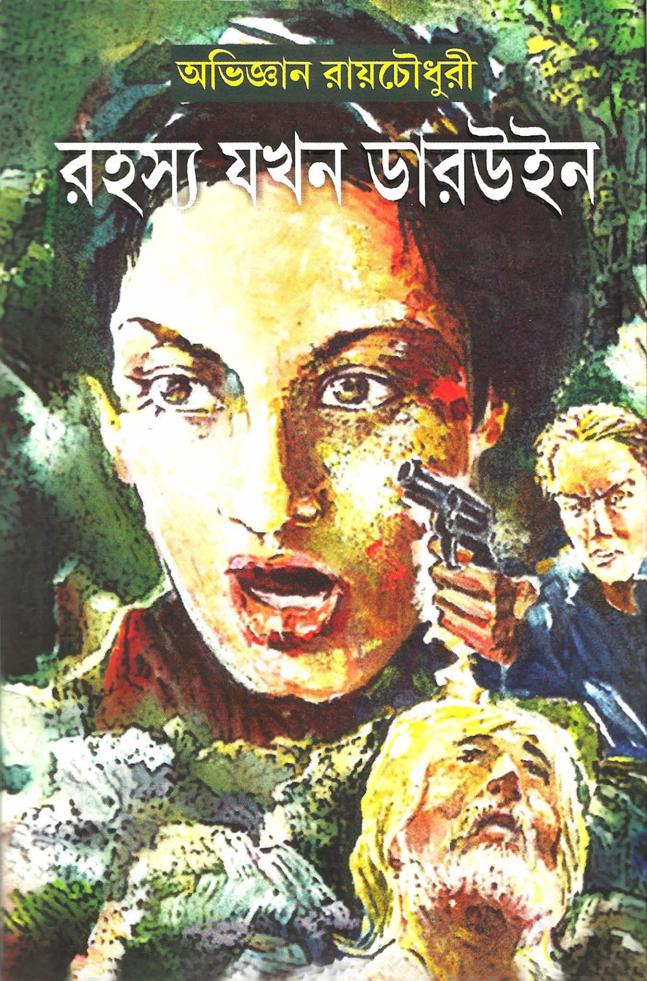
অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

রহস্য যখন ডারউইন



১

চার্লস ডারউইন গ্যালাপাগোস অভিযানের সময়ে পৌঁছেছিলেন এক অদ্ভুত দ্বীপে। তাঁর সহযাত্রী বন্ধুকে লেখা ডায়েরির ছেঁড়া পৃষ্ঠা উদ্ধার হল ১৫০ বছর পরে। চমকে উঠল অনিলিখা ও পল। নিরুদ্দিষ্ট বন্ধু ডেভিডের খোঁজে ওই দ্বীপে গেল তারা। কী দেখল সেখানে, যে দ্বীপ আজও পৃথিবীর মানচিত্রের বাইরে? এই দ্বীপ সম্পর্কে জানতেন শুধু মিশরের এক ফ্যারাও। কী ঘটবে এই দ্বীপে? হঠাৎই অনিলিখা আবিষ্কার করল, সে গভীর চক্রান্তের শিকার। শিকারির মূল লক্ষ্য! তারপর...?

২

ইতালি বেড়াতে এসে অনিলিখার একের পর এক আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! কেউ কি সারাক্ষণ নজর রাখছে ওর ওপর? কিন্তু কেন?...রোমে ও ভেনিসে দুই বিজ্ঞানীর মৃত্যু! হঠাৎ-হঠাৎ বিখ্যাত মানুষরা নিরুদ্দেশ। আবার ফিরেও আসছেন। কিন্তু তাঁরাই কি?...কেউ কি অন্য জাল ছড়াচ্ছে ক্ষমতা দখল করতে? অনিলিখা নিজেও কি পারবে সে জাল কেটে বেরোতে?

দুটি রুদ্ধশ্বাস সায়েন্স-অ্যাডভেঞ্চার, শেষ না করে স্বস্তি নেই।

অভিজ্ঞান রায়চৌধুরী

রহস্য যখন ডারউইন



পত্র ভারতী

প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ২০১২

RAHASYA JAKHON DARWIN

by

Abhigyan Roychowdhury

ISBN 978-81-8374-141-5

প্রচ্ছদ রাজীব পাল

অলংকরণ সুজিত চক্রবর্তী

মূল্য

১২০.০০

Publisher

PATRA BHARATI

3/1 College Row, Kolkata 700 009

Phones 2241 1175, 94330 75550, 98308 06799

e-mail : patrabharati@gmail.com

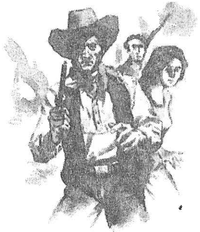
website : bookspatrabharati.com

Price ₹ 120.00

ত্রিদিবকুমার চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক পত্র ভারতী, ৩/১ কলেজ রো, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে প্রকাশিত এবং হেমপ্রভা প্রিন্টিং হাউস, ১/১ বৃন্দাবন মল্লিক লেন, কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে মুদ্রিত।

পত্র ভারতী প্রকাশিত
লেখকের অন্যান্য বই

সংকেত রহস্য
গ্লোবাল ওয়ার্মিং



সূচিপত্র



রহস্য যখন ডারউইন

17 মে, 2012

অনিলিখা?

—হ্যাঁ, বলছি।

—আমি আওয়েন। পল আওয়েন। চিনতে পারছ?

—আরে, চিনব না মানে? তা, হঠাৎ করে এতদিন বাদে?

—একটা জরুরি দরকারে ফোন করছি। ডেভিড তো তোমার খুব বন্ধু ছিল। তা ওর খবরটা শুনেছ তো?

—না। আমার সঙ্গে ওর গত দু-বছর ধরে কোনও যোগাযোগ নেই। কি খবর?

—দু-মাস আগে ও এক অভিযানে বেরোয়। একটা টিভি চ্যানেলের হয়ে ও গত একবছর কাজ করত। নানান দুর্গম জায়গায় গিয়ে সেখানকার গাছপালা-জীবজন্তু এসব চ্যানেলে দেখাত। তা এবার গিয়েছিল গ্যালাপাগোসের কাছাকাছি এক দ্বীপে। প্রশান্ত মহাসাগরের অজস্র দ্বীপের মধ্যে নাম না জানা এক দ্বীপ। গ্যালাপাগোস পর্যন্ত হেলিকপ্টারে গিয়ে তারপর সেখান থেকে বোটে। তারপর থেকেই তার আর কোনও খোঁজ নেই।

—সে কী! ও কি একা ছিল?

—না, ওর সঙ্গে একজন ক্যামেরাম্যান ছিল। নাম মিকুচি। তাকেও পাওয়া যাচ্ছে না।

—তা খোঁজাখুঁজি করা হয়নি?

—পুরো জায়গা জুড়ে অনেক তল্লাশি হয়েছে। এখনও কোনও সূত্র মেলেনি। অবশ্য ঠিক কোন দ্বীপে ও গিয়েছিল তা কেউ জানত না। আমার মনে হয় আরও তল্লাশি চালানো উচিত। এত তাড়াতাড়ি হাল ছাড়ার কিছু হয়নি।

—তা তুমি কি নিজে খুঁজে দেখতে চাও?

—হ্যাঁ, তবে আমি চাই তুমিও চলো আমার সঙ্গে। তুমি আগে আমার এখানে চলে এসো। তারপরে এখান থেকে একসঙ্গে যাওয়া যাবে। তোমার সঙ্গে আরেকটা ব্যাপারেও কথা বলার আছে। সামনাসামনি বলতে পারলে ভালো হয়। হয়তো ডেভিডের হারিয়ে যাওয়ার সঙ্গে এ ঘটনার কোনও কানেকশন থাকতে পারে।

—হেঁয়ালি না করে আসল কথাটা বলো তো!

—উহুঁ, ফোনে বলা যাবে না। সানফ্রান্সিসকো তো আগে এসো। তারপরে সব বুঝিয়ে বলব। এখন তুমি বলো কবে আসতে পারবে। সম্ভব হলে নেক্সট উইকএন্ডেই আমরা যেতে চাই। যত দেরি করব, খুঁজে পাওয়ার চান্স ততই কমবে।

—আরে, বললেই তো আসা যায় না। এখন অনেক

কাজের চাপ। তা ছাড়া খরচও অনেক।

—ভেবে দেখো। যাতায়াত, থাকাখাওয়া—সব খরচ আমার। এখানে তুমি জাস্ট দুদিন থাকবে। তারপরে আমরা বেরিয়ে পড়ব। ওই এলাকায় যত দ্বীপ আছে, সবক'টাতেই খোঁজ করব।

—ওরকম একটা রিমোট এলাকায় যাবে কীভাবে? জাহাজে?

—ধুর! আমার নিজস্ব প্লেন আছে। ওটাতে করেই যাব।

—সে আবার কবে কিনলে? তুমি আজকাল কী করো বলো তো?

—এই দ্যাখো! তুমি তো কিছুই খবর রাখো না। নিউমন্ট মাইনিং কোম্পানির নাম শুনেছ?

—শুনব না! নিউমন্ট মাইনিং-এর তো অনেক সোনার খনি আছে, তাই না?

—হ্যাঁ, কোম্পানিটা আমারই।

—তোমার তো তাহলে বিশাল ব্যাপার!

—দ্যাখো, এখন আর আমার কথা বলার সময় নেই। তুমি যাবে কি না আমাকে SMS-এ জানাও। আমি দু-ঘণ্টার মধ্যে তোমার ই-টিকিট আর ইনভিটেশন লেটার পাঠিয়ে দেব। এখানে এলে জমিয়ে দুদিন আড্ডা মারা যাবে। তখনই সব শুনবে।

ফোনটা রেখে অনিলিখা চুপ করে খানিকক্ষণ ভাবল। ইউনিভার্সিটি থেকে বেরোনোর পর একই জায়গায় ডেভিড আর ও একসঙ্গে কাজ করেছে কিছুদিন। এখনও চোখে ভাসে ওর চেহারা। উজ্জ্বল চোখ, টিকোলো নাক, কদমছাঁট চুল, হালকা গোঁফ ও দাঁড়ি। সামান্য চওড়া কপাল। কাজ অনেক আছে। তবু যেখানে ডেভিডের খোঁজে অভিযান হচ্ছে, সেখানে না যাওয়াটা অন্যায়।

পলও ইউনিভার্সিটিতে একসঙ্গেই পড়ত। বড়লোকের উচ্ছৃঙ্খল ছেলে। তেমন বন্ধুত্ব না থাকলেও ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর এক-দেড় বছর যোগাযোগ ছিল। এতদিন বাদে ওর কাছে অনিলিখার ফোন নম্বর থাকার কথা নয়। নির্ঘাত ফেসবুক বা ওই ধরনের কোনও সোশ্যাল নেটওয়ার্ক সাইট থেকে জোগাড় করেছে।

22 মে, 2012

সানফ্রান্সিসকো এয়ারপোর্ট থেকে বেরিয়েই চোখে পড়ল লম্বা কালো লিম্যুজিন। অনিলিখাকে দেখে গাড়ি থেকে বেরিয়ে এল পল আওয়েন। হালকা টি-শার্ট, জিন্‌স্‌, ব্যাকব্রাশ করা চুল। রেগুলার জিম করা চেহারা। সঙ্গে দুজন সিকিউরিটি

গার্ড। ভারী গলায় পল বলে উঠল,—ওয়েলকাম টু সানফ্রান্সিসকো।

—কেমন আছ পল? তুমি এত ব্যস্ত লোক। কাউকে দিয়ে গাড়িটা পাঠিয়ে দিলেই তো পারতে!

—ছাড়ো তো ব্যস্ততা! ইউনিভার্সিটি ছাড়ার পর এতদিন বাদে তোমার সঙ্গে দেখা, আর আমি আসব না? তুমি কিন্তু একটু মোটা হয়েছ।

—তা হব না! কলকাতাতে তো আর এখানকার মতো এত খেলাধুলোর সময় হয় না। সুযোগও এত নেই।

গাড়িতে উঠে বসল অনিলিখা। লিমুজিনের লেদার সোফায় গা এলিয়ে অনিলিখা বলে ওঠে,—তা আজকের প্ল্যান কী?

—তুমি একটু রেস্ট নিয়ে নাও। এত লং জার্নি। তারপর দেখা যাবে।

—হ্যাঁ, যা বলেছ। যতই আরামে আসো না কেন, তিরিশ ঘণ্টা জার্নির পর আর এনার্জি থাকে না।

—তুমি সানফ্রান্সিসকোয় আগে এসেছ তো?

—না, এয়ারপোর্ট হয়ে অন্য জায়গায় গেছি। শহরটা আর ঘুরে দেখা হয়নি।

—সেকী! সানফ্রান্সিসকো দ্যাখোনি? যখন দরকার আমার ড্রাইভারকে ফোন করবে। ও তোমাকে সানফ্রান্সিসকো ঘুরিয়ে

আনবে। আর কোথাও না যাও গোল্ডেন গেট, ক্রুকেড স্ট্রিট, ফিশারম্যান্‌স হোয়ার্ফ মিস কোরো না। পারলে একবার কেব্‌ল কারটাও চড়ে নিও।

—হ্যাঁ, সানফ্রান্সিসকো এসেছি, আর এখানকার কেব্‌ল কার চড়ব না—তা হয় নাকি?

কথা বলতে বলতে লিম্যুজিনের কালো কাচের বাইরে তাকাল অনিলিখা। বাইরের ঝকঝকে সকালের আলোটাকে পুরোপুরি কাড়তে পারেনি বুলেটপ্রুফ কাচের জানলা। মাঝে মাঝে সমুদ্র দেখা যাচ্ছে। শহরের রাস্তা উঁচু-নীচু। পাহাড়ি এলাকা। শহরের মধ্যেই অনেকগুলো পাহাড়। সমুদ্র আর পাহাড়ের এই কম্বিনেশনটাই সানফ্রান্সিসকোকে এত আকর্ষণীয় করে তুলেছে।

1821 সাল অবধি সানফ্রান্সিসকো স্পেনের অধীনে ছিল। তারপরে মেক্সিকোর আওতায় আসে। 1846 সালে মেক্সিকো আর আমেরিকার যুদ্ধের পরে আমেরিকার মধ্যে আসে।

সানফ্রান্সিসকো শহরের বিল্ডিংগুলো তাই আমেরিকার অন্যান্য শহরের থেকে আলাদা। স্প্যানিশ স্থাপত্যের ছোঁয়া। রাস্তার দু-ধারে ইউরোপিয়ান ভিক্টোরিয়ান হাউস। পলের লিম্যুজিন শহরের গণ্ডি পেরিয়ে সমুদ্রের ধার বরাবর চলল। একদিকে খাড়া পাহাড়, অন্যদিকে খাদ। পড়লে নীচে সমুদ্রে। হাইওয়ে ওয়ান যেন এঁকেবেঁকে পাহাড়কে

তাড়া করে চলেছে।

খানিকবাদে হাইওয়ে থেকে একটা বাঁক নিয়ে গাড়ি জনবিহীন সরু রাস্তা ধরল। রাস্তাটা চড়াই। ক্রমশ ওপরের দিকে উঠেছে। মিনিট-পাঁচেক বাদে গাড়িটা একটা বাড়ির গেটের সামনে এসে দাঁড়াল। বাড়ি বললে ভুল হবে—প্যালেস। গেট পেরিয়ে বাগান, ফোয়ারা। আর বাগানের পর গেটের থেকে প্রায় আধমাইল দূরে পলের 'আওয়েন প্যালেস'।

23 মে, 2012

ব্রেকফাস্টের পরই অনিলিখা গাড়ি নিয়ে বেরিয়ে পড়ল সানফ্রান্সিসকো দেখতে। মেঘমুক্ত ঝকঝকে আকাশ। ঘোরার আদর্শ পরিবেশ। মাঝে মাঝে ঠান্ডা হাওয়া বয়ে যাচ্ছে।

1906 সালে সানফ্রান্সিসকো প্রায় পুরোপুরি ধ্বংস হয়ে গিয়েছিল। ভূমিকম্পে শহরের বেশিরভাগ বিল্ডিং ভেঙে গিয়েছিল। গ্যাসলাইনের পাইপ ফেটে সারা শহরে আগুন লেগে গিয়েছিল। খবরের হেডলাইন হয়েছিল, 'সানফ্রান্সিসকো সিজ্‌ড টু এক্সিস্ট'। কিন্তু দশ বছরের মধ্যেই এ শহর আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়। প্রায় তখন থেকেই সারা পৃথিবীর ব্যাঙ্কিং ইন্ডাস্ট্রির নাভিকেন্দ্র হিসেবে জায়গা করে নিয়েছিল

সানফ্রান্সিসকো। আজও বিশ্বের প্রধান প্রধান ব্যাঙ্কগুলোর বেশিরভাগের হেড অফিস সানফ্রান্সিসকো। পথেও তাই যেতে যেতে চোখে পড়ে নানান ব্যাঙ্কের বিশাল বিশাল বিল্ডিং।

প্রথমেই গোল্ডেন গেট ব্রিজ। ব্রিজের ওপর দিয়ে যাওয়ার সময় অবশ্য তেমন কিছু বোঝা যায় না। দূরে একটা ভিউ পয়েন্ট থেকে ব্রিজ দেখতে হয়। সেখানে গিয়েও অনিলিখার আশা মিটল না। ব্রিজ কুয়াশায় ঢেকে আছে। এটাই সানফ্রান্সিসকোর সমস্যা। শহরের উত্তাপ আর প্রশান্ত মহাসাগরের ঠান্ডা হাওয়া বেশিরভাগ সময় শহরটাকে কুয়াশার চাদরে ঢেকে রাখে।

ঘোরার তালিকায় এর পরেই এল কেব্‌ল কার। কেব্‌ল কার ছাড়ে মার্কেট স্ট্রিট আর পাওয়েল স্ট্রিটের জংশন থেকে। পৃথিবীর সবথেকে নামকরা কেব্‌ল কার।

গাড়ি পার্কিং জোন-এ রেখে টিকিট কেটে কেব্‌ল কারে উঠে পড়ল অনিলিখা। রাস্তার নীচে দিয়ে কেব্‌ল কারের দড়ি গেছে। পাহাড়ের ঢাল অনুযায়ী উলটোদিক থেকে আসা কেব্‌ল কারের সঙ্গে ব্যালান্স করে এই কেবল কারটা এগিয়ে যাচ্ছে। দু-কামরার ছোট গাড়ি। সামনের কামরাটার দু-ধার খোলা। তাতেই বসল অনিলিখা। বাইরেটা ভালো করে দেখা যায়। গাড়ির পাদানিতে পা রেখে অনেকে ঝুলে ঝুলে যাচ্ছে।

অসাধারণ দৃশ্য। সরু রাস্তার দু-ধারে ভিক্টোরিয়ান স্টাইলের বাড়ি। মাঝেমধ্যে আড়াআড়ি রাস্তা নেমে গেছে দু-ধার দিয়ে। নেমে গেছে বললে কম বলা হয়, মনে হয় নীচের দিকে ডাইভ দিয়েছে। ড্রাইভার ঘণ্টা বাজাতে বাজাতে এগিয়ে চলেছে চড়াই ধরে। গাড়ি হঠাৎ করে থামানো শক্ত। এ গাড়িতে ওঠা মানে যেন একশো বছর পিছিয়ে যাওয়া।

হঠাৎ অনিলিখার চোখ পড়ল পাশেই দাঁড়িয়ে থাকা লোকটার দিকে। ঘাড় অবধি ঝাঁকড়া চুল। কানে দুল। দাড়ি। শক্তপোক্ত এক্সারসাইজ করা চেহারা। জন পেচি না!

—জন!

জন চমকে অনিলিখার দিকে মুখ ফেরাল।

—অনিলিখা, হোয়াট আ সারপ্রাইজ! তুমি এখানে কোত্থেকে? বেড়াতে এসেছ?

—হ্যাঁ, তা বলতে পারো। তুমি?

—আমি ন্যাচারাল সায়েন্স মিউজিয়ামের সঙ্গে যুক্ত আছি।

—ওখানে তোমার মতো সায়েন্টিস্ট আবার কী করছে?

—আপাতত একজন মহিলাকে নিয়ে খুব ব্যস্ত আছি। 'হ্যাত্-শেপ্-সুৎ'-এর নাম শুনেছ?

—মিশরের রানি। খুব সফল ফ্যারাও ছিলেন শুনেছি।

—ঠিক বলেছ। তবে রানি নন, রাজা। মেয়ে হয়েও রাজা পরিচয়েই বাইশ বছর দাপটে শাসন করে গেছেন। মিশরীয়

সভ্যতার সেই প্রথম ও শেষ। নকল দাড়ি পরতেন। সব জায়গায় ওনার পরিচয় রাজা হিসেবে। তা, ওনাকে নিয়েই ব্যস্ত আছি এখন।

—আচ্ছা, কয়েক বছর আগে ওনার মমি পাওয়া গিয়েছিল না?

—1922-এ হাওয়ার্ড কার্টার মিশরের 'ভ্যালি অব দ্য কিংস' থেকে ফ্যারাওদের মমি আবিষ্কার করেন তা তো জানোই। অন্য ফ্যারাওদের মমি পাওয়া গেলেও 'হ্যাত-শেপ্-স্যুৎ'-এর মমি প্রথমে পাওয়া যায়নি। ওর মমি সে সার্কোফ্যাগাস-এ ছিল, সেটা শুধু পাওয়া যায়। তাতে কোনও মমি ছিল না। 2006-এ একটা বেনামি মমি পাওয়া যায়। মমিটা এমন নিখুঁতভাবে সংরক্ষিত হয়েছিল যে তা থেকেই প্রথম সন্দেহ—কোনও ফ্যারাও-এর নয়তো? তা না হলে অত পারফেক্টলি মমিফিকেশন হয় না। ঠিক তাই। পরে দেখা গেল ওটা ওনারই মমি। নির্ঘাত দুস্যুরা ওই সার্কোফ্যাগাস ভেঙে মমির অলঙ্কার চুরি করে ওটা বাইরে ফেলে গিয়েছিল।

—তা ওটাই যে 'হ্যাত্-শেপ্-সুৎ'-এর মমি তা নিশ্চিত হল কীভাবে?

—ওর সার্কোফ্যাগাস যখন পাওয়া যায়, তখন সেই বাক্সে একটা দাঁতের ভাঙা অংশ পাওয়া গিয়েছিল। এই মমির দাঁতের সঙ্গে ওই দাঁতের অংশ একেবারে মিলে যায়।

—এক্সাইটিং! তা তোমার রিসার্চটা কী?

—চলো, কেব্‌ল কার থামলে নেমে বলব।

ঠিক কথা। এ সব গুরুগম্ভীর আলোচনা শুনে আশপাশের লোকজন নির্ঘাত বিরক্ত হচ্ছে। আর এত আওয়াজের মধ্যে কথা বলাও খুব মুশকিল।

চায়না টাউনে কেব্‌ল কার থামলে ওরা নেমে হাঁটতে থাকে। চায়না টাউন যেন ছোট একটা চিন। একটা সময় সানফ্রান্সিসকোতে রেলের রাস্তার কাজ করতে অনেক চাইনিজ এসেছিল। তারা পরে এখানেই থেকে যায়। আর তারই চিহ্ন চায়না টাউন। ওরা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলতে থাকে।

—মমির গায়ে কোনও কিছুই ছিল না। শুধু গলায় মালার মতো পরা ছিল প্যাপিরাস পাতায় আঁকা গিয়ার হুইলের ছবি। জন বলে ওঠে।

—গিয়ার হুইল? ওই সময়ে? আমার ধারণা ছিল গিয়ারের প্রথম ব্যবহার হয় রোমান সাম্রাজ্যে।

—প্রিসাইসলি। 'হ্যাত্‌-শেপ্‌-স্যুৎ'-এর রাজত্বকাল ছিল 1479 থেকে 1458 BC অর্থাৎ, রোমান সাম্রাজ্যের অনেক আগে। তাই ওই ছবি দেখে আমরাও অবাক হয়ে যাই। ওই সময়ে গিয়ারহুইল। তো এখানেই শেষ নয়। ওই একই ডিজাইনের গিয়ার হুইল পাওয়া গেল বারমুডা ট্রায়াংগেলে ডুবে যাওয়া এক পুরোনো জাহাজে। গিয়ার হুইল না বলে

ওটাকে বলা যায় মেকানিকাল কম্পিউটার। 37 টার মতো গিয়ার চালিত একটা ঘড়ি।

—এক্সাইটিং! এটা তো মাসতিনেক আগের ঘটনা। তাই না? সায়েন্টিফিক আমেরিকান ম্যাগাজিনে পড়েছিলাম। রিসেন্টলি ডোবা একটা জাহাজ খুঁজতে গিয়ে একই জায়গায় ডোবা আরেকটা পুরোনো জাহাজের সন্ধান পাওয়া যায়। এটা হাজারতিনেক বছর আগে ডুবেছিল। সেই জাহাজেই পাওয়া যায় গিয়ার হুইলটা।

—নাহ্, তোমার এখনও পড়াশুনোর ভালোই অভ্যেস আছে। তা সেই গিয়ার হুইল আর মমির গায়ে আঁকা ছবির ডিজাইন একদম এক। জাহাজটা ইজিপ্ট থেকে আসছিল। হ্যাত্-শেপ্-সুৎ-এর ছবি আঁকা মুদ্রাও পাওয়া যায় জাহাজে।

—অর্থাৎ তোমরা নিশ্চিত যে ওই গিয়ার হুইল আর হ্যাত্-শেপ্-সুৎ ওয়েল কানেক্টেড। আর তাই তোমাদের জানা দরকার গিয়ার হুইলটা কী কাজ করত। নিশ্চয়ই খুব দরকারি কিছু হবে। ঠিক তো? তা কিছু রহস্য উদ্ধার হয়েছে?

—কিছুটা হয়েছে। তবে সেটা গুছিয়ে শুনতে গেলে একটা ক্যাফেতে বসতে হবে। রাজি?

—শিওর।

পাশেই একটা 'সিয়াটেল কফি' ছিল। তাতে ঢুকে দুটো ব্ল্যাক কফির অর্ডার দেওয়ার পর ফের কথা শুরু হল।

—তা তুমি থাকছ কোথায়? জন জিজ্ঞাসা করে।

—পল আওয়েনকে চেনো? আমি ওরই বাড়িতে এসে উঠেছি।

—আরে, পল আওয়েনকে চিনব না? বিশাল বড়লোক। ইনফ্যাক্ট, আমাদের এই প্রোজেক্টটা তো ও-ই ফান্ড করছে। অসাধারণ লোক। আমার সঙ্গে আগে আলাপ ছিল না। 'হ্যাত্-শেপ্-সুৎ'-এর মমি এখানে রিসার্চের জন্য আনা হয়েছে শুনে দেখতে আসে। সায়েন্সে এত ইন্টারেস্ট! সব দেখেশুনে যাওয়ার তিনদিন পরে টু মিলিয়ন ইউ এস ডলার গ্রান্ট। ভাবতে পারো?

—ও কিন্তু আমাকে এ ব্যাপারে কিছুই বলেনি। অবশ্য কাল থেকেই দেখছি—এত ব্যস্ত থাকে! আমি এখানে এসেছি ডেভিডের খোঁজ করতে। ডেভিড রয়।

জনের কপালে ভাঁজ পড়ল,—এক্সট্রিমলি আনফরচুনেট। আমি ওর প্রোগ্রামটা রেগুলার ফলো করতাম। অসাধারণ কভারেজ থাকত। একটা রিমোট এলাকায় চলে যেত। সেখান থেকে ওখানকার অপরিচিত অর্ধপরিচিত গাছপালা, জীবজন্তু এসব দেখাত। খুব ইন্টারেস্টিং। তা এবার যে কী হল! নো ট্রেস। প্রচুর খোঁজাখুঁজি হয়েছে। কিন্তু না ডেভিড, না ওর সঙ্গীর কোনও খোঁজ পাওয়া গেছে। ও কি তোমার পরিচিত?

—হ্যাঁ, আমরা একসঙ্গে একই ইউনিভার্সিটিতে পড়েছি।

তবে সাবজেক্ট আলাদা। আমার ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, ডেভিডের সাবজেক্ট কম্পিউটার সায়েন্স আর পল মেকানিক্যালের। ডেভিড আমার খুব বন্ধু ছিল। সে জন্যই পল আমাকে ডেকে নিল। আমরা ডেভিডকে খুঁজতে যাব। তবে এখনও জানি না আমি কীভাবে অভিযানে সাহায্য করব।

একটু থেমে অনিলিখা ফের বলে উঠল,—এবার আসল কথায় ফিরে আসা যাক। গিয়ার হুইলের রহস্যোদ্ধার কদ্দূর?

—আমাদের ধারণা, 'হ্যাত্‌-শেপ্‌-সুৎ'-এর মেন পাওয়ার ছিল ওই গিয়ার হুইলটা। তা না হলে, ভাবো, মেয়ে হওয়া সত্ত্বেও দেশে ওর বিরুদ্ধে কোনও বিদ্রোহ হল না। ফ্যারাও বলে সবাই একবাক্যে মেনে নিল। 'হ্যাত্‌-শেপ্‌-সুৎ' যতদিন বেঁচে ছিল অন্য দাবিদার 'তুৎমোস-3' চুপচাপ হাত গুটিয়ে বসে রইল। তুৎমোস-3 সত্যিকারের ক্ষমতা পায় 'হ্যাত্‌-শেপ্‌-সুৎ'-এর মৃত্যুর পরে।

সবের পিছনে ছিল ওই গিয়ার হুইলের পাওয়ার। অ্যাকচুয়ালি সি ওয়াজ আ সায়েন্টিস্ট। ওই গিয়ার হুইলের ডিজাইন ওনারই আবিষ্কার। চন্দ্র-সূর্য আর কয়েকটা গ্রহের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে প্রাকৃতিক দুর্যোগ কবে কোথায় হবে, সেটা বলা সম্ভব হত ওই গিয়ার হুইলের সাহায্যে। অন্তত হাইরোগ্লিফসের লেখা পড়ে ওই যন্ত্রের সম্বন্ধে এরকমই ধারণা হয়েছে। যন্ত্রের সাহায্যে উনি ওটা নিখুঁতভাবে

বলতেন বলেই সবাই ওনাকে ঈশ্বর বলে মেনে নিয়েছিল। ওনার ফ্যারাও হওয়া নিয়েও তাই প্রশ্ন ওঠেনি।

—এরকম কি সম্ভব? এখনও আমরা জানি না, আর সাড়ে তিন হাজার বছর আগে উনি জানতেন?

—পৃথিবীর আর সূর্যের অবস্থানের ওপর নির্ভর করে পৃথিবীর ওপর সৌরবিকিরণ পরিবর্তিত হয়। সোলার ফ্লেয়ার। আর তার একটা প্রভাব থাকে ভূমিকম্পের—ভলক্যানোর জেগে ওঠার ওপর। আমরা শুধু এটুকু বুঝতে পেরেছি। তবে কোথায় হবে, কবে হবে—এসব যন্ত্রটা কীভাবে অনুমান করত সেটাই রহস্য।

—তা যে জাহাজটা ডুবেছিল, সেখানে ওই যন্ত্রটা ছিল কেন বলো তো?

—কে জানে? হয়তো জাহাজ যাতে কোনও বিপজ্জনক জায়গায় না যায় তারজন্য ওই ব্যবস্থা। আর যন্ত্রটা যেখানে পাওয়া গিয়েছিল তার কাছেই একটা মহার্ঘ্য বাক্সের মধ্যে একটা হাতে আঁকা ম্যাপও ছিল। অনেক ক্যালকুলেশন করা একটা কাগজও ছিল। ম্যাপটাও আমরা দেখছি। ওই ম্যাপে একটা বিশেষ জায়গা হাইলাইটেড আছে। ওটা কোন জায়গা বার করার চেষ্টা করছি।

—তা অত আগের কাগজ পড়ার মতো আছে?

—এখন টেকনোলজি অনেক এগিয়ে গেছে। এক্সরে

টোমোগ্রাফি আর সারফেস স্ক্যানিং করে পুরোনো লেখার ছাপ খুঁজে বার করা হয়। প্রবলেমটা হল ম্যাপটা বোঝা। তখন তো ওদের পৃথিবী সম্বন্ধে ধারণাটাই অন্যরকম ছিল।

—ঠিক আছে, তোমার রিসার্চ সফল হোক—তাড়াতাড়ি রহস্যোদ্ধার হোক। আজ আমি উঠি। পল হয়তো ডিনারে আমার জন্য ওয়েট করবে। ওখান থেকে ফিরে এসে তোমার সঙ্গে যোগাযোগ করব।

ফোন করে অনিলিখা ক্যাফের সামনে গাড়িটাকে ডেকে নিল। ফিরতে হবে। সানফ্রান্সিসকোর সরু সরু রাস্তার মধ্যে দিয়ে এই লিম্যুজিন নিখুঁতভাবে চালানো সোজা কথা নয়। তা সেটা পলের ড্রাইভার ভালোই জানে। এক ঘণ্টার মধ্যে 'আওয়েন প্যালেস' পৌঁছে গেল অনিলিখা।

24 মে, 2012

ব্রেকফাস্ট টেবিলে চিকেন সসেজ খেতে খেতে অনিলিখা বলে উঠল,—পল, কাল জন পেচির সঙ্গে দেখা হয়েছিল!

একটু চমকে উঠে পল বলে উঠল,—জনকে তুমি চিনলে কী করে? ব্রিলিয়ান্ট সায়েন্টিস্ট।

—আমি আর জন একসঙ্গে মোটোরোলাতে কিছুদিন কাজ

করেছি। এখন তো ও 'হ্যাত্-শেপ্-সুৎ'-এর গিয়ার হুইল নিয়ে রিসার্চ করছে। তোমার ডোনেশনের কথাও বলল।

—হ্যাঁ, ডোনেশনটা বড় কিছু না। ভেবে দ্যাখো তো একজন ফ্যারাও—তারও বিজ্ঞানে কত আগ্রহ! অত কাজের মধ্যেও এরকম একটা জিনিস তৈরি করেছে। আর আমরা? বিজ্ঞানের ছাত্র হয়েও কাজের বাইরে কিছুই করি না।

—জন বলছিল, হয়তো এই যন্ত্রের ক্ষমতার জন্যই সবাই ওকে ঈশ্বর বলে মানতে শুরু করে। এ জন্যই ওর পঁচিশ বছরের শাসনে কখনও কোনও প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়নি। আর এটাই ওকে এক সফল ফ্যারাও করে তুলেছিল। তাই নিছক বিজ্ঞানে আগ্রহ না, টিকে থাকার তাগিদেই এটা ওনাকে করতে হয়েছিল। এ জন্যই তো গিয়ার হুইলের রহস্য তাড়াতাড়ি উদ্ধার করা দরকার।

কফিতে চুমুক দিয়ে টাইয়ের নটটা টাইট করতে করতে পল ফের বলে উঠল,—সে কথা ছাড়ো, তোমাকে একটা খুব গোপনীয় কথা বলছি। আমার-তোমার বাইরে এ কথা যেন আর কেউ জানতে না পারে। আমি জানি ডেভিড কোথায় গিয়েছিল, আর সেজন্যই নিজে তল্লাশি চালাতে চাই।

—সেকী! সে কথা তুমি পুলিশকে জানাওনি?

—না। সে কথাটা বোঝাতে গেলে যা বলতে হত, তা নিয়ে হইচই শুরু হয়ে যেত। কারণ সেখানে চলে আসত

চার্লস ডারউইনের নাম। চার্লস ডারউইনের বিখ্যাত বিগ্‌ল যাত্রার কথা কে না জানে! আর এখানে যা বলতে হত তা ওই যাত্রার সঙ্গেই নিবিড়ভাবে যুক্ত। আর সেটাই আমি আপাতত জানাতে চাই না।

—কি বলছ পল?

—আমার ঠাকুরদার ঠাকুরদা কে ছিলেন বলো তো? রিচার্ড আওয়েন। উনি ছিলেন লন্ডনের বিখ্যাত অ্যানাটমিস্ট আর চার্লস ডারউইনের বন্ধু। চার্লস ডারউইন তাঁর বিখ্যাত বিগ্‌ল যাত্রার সময় যত ফসিল পেতেন তা সব লন্ডনে আমার পূর্বপুরুষকে পাঠিয়ে দিতেন। অ্যাকচুয়ালি রিচার্ডই ফসিল দেখে বলে দিতেন যে ওটা পরিচিত কোনও প্রাণী, না বিলুপ্ত কোনও প্রাণীর ফসিল। আর কার সঙ্গে রিলেটেড, কতটাই বা মিল। এভাবেই মেগাথেরিয়াম আবিষ্কৃত হয়।

—তাই নাকি? সেরকমভাবে তো ওনার নাম শুনিনি!

—সেটাই তো দুর্ভাগ্য! অথচ ডারউইনের সমস্ত কৃতিত্বের পিছনে মূলত রিচার্ড আওয়েনরই অবদান! তা না হলে ডারউইন ফসিল দেখে কিছুই বুঝতে পারতেন না। ওনার এ ব্যাপারে কিছুই পড়াশুনো ছিল না। আর 'অরিজিন অফ স্পিসিস'-এর মতো বইও লিখতে পারতেন না। কারণ ওনার পুরো 'ন্যাচারাল সিলেকশন'-এর আইডিয়াটাই তো ফসিল নির্ভর। ওনার নিজের মনেই প্রশ্ন ছিল কেন কিছু প্রাণী বিলুপ্ত

হয়ে গেছে, আর কেনই বা একইরকমের একই প্রজাতির কিছু প্রাণী আজও বহাল তবিয়তে আছে। পরে বোঝেন, যারা পরিবর্তনের মাধ্যমে পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে তারাই টিঁকে থাকে। পরিবর্তন সফল না হলে চিরকালের মতো তারা হারিয়ে যায়।

—তা তোমার গোপনীয় কথাটা কী? ডারউইন তো পুরো যাত্রাটার কথাই 'ভয়েজ অব দ্য বিগ্‌ল-এ লিখে গেছেন। আমিও বইটা পড়েছিলাম। দারুণ লেখা। অসাধারণ দৃষ্টিশক্তি। অসাধারণ খুঁটিয়ে দেখার ক্ষমতা।

—পুরোটা পড়েছ?

—হ্যাঁ। 1831-এ বেরিয়ে 1836-এ আবার ইংল্যান্ডে ফিরে আসেন। ইংল্যান্ডের ডাভেনপোর্ট থেকে যাত্রা শুরু হয়েছিল। তখন কে জানত যে এটা ইতিহাসের সবথেকে ফেমাস জার্নি হতে চলেছে, তাই না?

—কিন্তু 'ভয়েজ অব দ্য বিগ্‌ল'-এ তো পুরো যাত্রাটার কথা ছিল না।

—মানে?

—যাত্রা শুরু হয় 27 ডিসেম্বর, 1831-এ। 17 ফেব্রুয়ারি 1832, বিগ্‌ল নিরক্ষরেখা ক্রস করে দক্ষিণ গোলার্ধে ঢোকে। ওই সালেরই 29 ফেব্রুয়ারি ওরা ব্রাজিলের বাহিয়া পৌঁছোয়। ওদের মেন কাজটা ছিল দক্ষিণ আমেরিকার তটভূমি সার্ভে

করা। তাই পুরো দক্ষিণ আমেরিকার কোস্টলাইন বরাবর ওরা যায়। ওরা যে শুধু সমুদ্র ধরেই গিয়েছিল, তা কিন্তু নয়। ওদের বেশ কিছু সময় ল্যান্ডেও কেটেছিল। ডারউইনের অনেকটা সময় কেটেছিল আর্জেন্টিনার প্যাম্পাসে, অ্যাটাকামা মরুভূমিতে আর আন্দেজ পাহাড়ে। তা না হলে এই অভিজ্ঞতা হত না। 20 অক্টোবর, 1835 সালে বিগ্‌ল গ্যালাপাগোস দ্বীপ থেকে ইংল্যান্ডের উদ্দেশ্যে ফিরতে শুরু করে। তাহিতি, নিউজিল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া, মরিশাস, কেপ অফ গুড হোপ, সেন্ট হেলেনা, অ্যাসিকন দ্বীপ ছুঁয়ে ইংল্যান্ডের ফলমাউথে ফিরে আসে 1836 সালের 2 অক্টোবর।

—তোমার তো সব ডেট মুখস্থ দেখছি।

—তার কারণ, ওই ডেট নিয়েই তো গণ্ডগোল। 1835 সালের 20 অক্টোবর-এর পর থেকে নেক্সট কুড়ি দিনের কথা ডারউইনের লেখায় পাওয়া যায় না। প্রশ্ন, ও ক'দিন উনি লেখেননি কেন? নাকি লিখেছিলেন, কিন্তু কোনও কারণে সে লেখা প্রকাশ করেননি।

—হতেই পারে মাঝে কয়েকদিন লেখেননি।

—ঘটনাটা হল, উনি লিখেছিলেন, কিন্তু একটা বিশেষ কারণে ওই লেখার পাতাগুলো উনি ডায়েরি থেকে ছিঁড়ে বন্ধু রিচার্ড আওয়েন-এর কাছে পাঠিয়ে দেন।

—মানে? তুমি সে লেখা দেখেছ?

—হ্যাঁ। সেটাই বলছি। বাড়ির সিন্দুকে খুব যত্নে কয়েকটা পাতা ল্যামিনেটেড অবস্থায় বহুদিন ধরেই রাখা ছিল। ওই সিন্দুকে আমাদের পরিবারের অন্যান্য মূল্যবান জিনিসও রাখা আছে। শুনেছিলাম ওটা রিচার্ড আওয়েনের লেখা ডায়েরির কিছু পাতা। বাকি ডায়েরিটা ছিল না। তাই ওটা ওনারই লেখা কি না তা কখনও বোঝার উপায় ছিল না। দু-মাস আগে সিন্দুকের জিনিসগুলো গোছাতে গিয়ে ওই পাতাগুলো আমার নজরে আসে। কৌতূহলবশত পড়ে ফেলি। পড়েই মনে হল এটা রিচার্ড-এর লেখা নয়, কারণ রিচার্ড তো বিগ্‌লে যাননি। এ নির্ঘাত স্বয়ং ডারউইনের লেখা, ঠিক ওই মাঝের কুড়ি দিনের—যা ওই 'ভয়েজ অব দ্য বিগ্‌লে' বেরোয়নি। আমার আগের তিন প্রজন্ম ব্যবসা ছাড়া আর কিছুই করেননি। তাই ওই লেখা বোঝার যোগ্যতা কারও ছিল না।

—তা তুমি কি ওই লেখা ডেভিডকে দেখিয়েছিলে?

—ঠিক তাই। ওই লেখাতেই ছিল আরেকটা আইল্যান্ডের কথা, যেখানে ডারউইনরা গ্যালাপাগোস-এর পরে যান। সেখানে ওনাদের অদ্ভুত অভিজ্ঞতা হয়। এমন কোনও অদ্ভুত আইল্যান্ড আমাদের পরিচিত বিশ্বে নেই। ডেভিডকে আমি ওই আইল্যান্ডে জয়েন্টলি যাওয়ার কথা বলি। ডেভিড তখন তেমন আগ্রহ দেখায়নি। তখনই আমার সন্দেহ হওয়া উচিত ছিল। এটাই তো ওর ইন্টারেস্ট এরিয়া। আমি নিশ্চিত যে

ও ওখানেই গেছে। আর একা ওই আইল্যান্ডে গিয়েই ও বিপদে পড়েছে।

—তা ঠিক কী লেখা ছিল ওই আইল্যান্ড সম্পর্কে?

—দাঁড়াও তার জন্য ওই পাতাগুলো বার করা দরকার। মুখটা টিস্যু পেপারে মুছে নিয়ে পল বলে ওঠে,—আজ রাতে তোমাকে দেখাব। তবে খেয়াল রেখো এ কথা যেন কেউ না জানতে পারে।

24 মে, 2012, রাত আটটা

আগামী কালই অনিলিখারা বেরিয়ে পড়বে। সমস্ত ব্যবস্থা রেডি। ও আর পল ছাড়া অভিযানে যাবে রবার্ট। রবার্ট খুব ভালো শিকারি। অজানা দ্বীপ। সঙ্গে শিকারি থাকা দরকার। এ ছাড়া থাকবে পাইলট। তবে ঠিক হয়েছে পাইলট দ্বীপের ভেতরে ঢুকবে না। বাইরেই থাকবে।

অনিলিখা আর পল এসে স্টাডি রুমে বসেছে। বিশাল স্টাডি রুম। মেঝে, দেওয়াল সব কাঠের। দামি পাইন কাঠ। ঘরের হলদেটে আলোয় পলের মুখের দুপাশে পড়া ভাঁজ আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। মুখটাকে আরও কঠিন করে তুলেছে। ল্যামিনেট করা কয়েকটা পাতা সামনের বড়

টেবিলের ওপর রেখে পল বলে উঠল,—পৃথিবীর সব থেকে বিখ্যাত ডায়েরির পাতা। কি আমি পড়তে শুরু করব?

অনিলিখা মাথা নেড়ে সম্মতি জানাতে পল শুরু করল—

ডারউইনের ডায়েরি

23 অক্টোবর, 1835, বিকেল পাঁচটা

আমাদের পরবর্তী গন্তব্য অস্ট্রেলিয়া। লম্বা পথ। মাঝে কিছু পলিনেশিয়ান আইল্যান্ড দেখার ইচ্ছে আছে। গ্যালাপাগোস দেখার রোমাঞ্চ এখনও ভুলতে পারছি না। ওইটুকু একটা আইল্যান্ড। আর তার মধ্যেই এত বৈচিত্র্য। আর্জেন্টিনার প্যাম্পাসে আমার যে ধারণা হয়েছিল, সেটাই যেন আরও দানা বাঁধতে শুরু করেছে। ওখানে যে অস্ট্রিচ দেখেছিলাম তা যেন অন্য অস্ট্রিচদের থেকে আলাদা। পা-গুলো ছোট ছোট। ওপরের দিকটা আরও ভারী। গ্যালাপাগোসে ওই অস্ট্রিচেরই আরেক রূপ দেখলাম। এগুলোর পা বড়। এই যে একই প্রাণীর নানান চেহারা—তা কি নানান জায়গায়, নানান পরিবেশে মানিয়ে নেওয়ার প্রয়োজনে?

এই যে হামিং বার্ড—এই পাখির নানান চেহারা নানান দ্বীপে। কোথাও এদের ঠোঁট লম্বা, সরু। কোথাও ঠোঁট ছোট, গোল। যে দ্বীপ যত বেশি পাথুরে, সেখানে এদের ঠোঁট তত সরু-লম্বা। পাথরের ফাঁক থেকে খাবার খুঁজে বার করার তাগিদেই কি ওদের চেহারার এই পরিবর্তন? যেখানে ওরা পরিবেশের সঙ্গে মানিয়ে পরিবর্তনে সফল হয় না, সেখানেই কি বিলুপ্ত হয়ে যায়?

আমরা প্যাম্পাসে যে অস্ট্রিচটাকে রোস্ট করে খেলাম, তার হাড়গোড় ইংল্যান্ডে পক্ষী বিশারদ জন গোল্ডকে পাঠিয়েছিলাম। ও বলল, ওটা নাকি অস্ট্রিচ নয়—রিয়া। রিয়ার সংখ্যা বর্তমানে সাংঘাতিকভাবে কমে এসেছে। আমারও ওই পাখিটাকে দেখে তাই মনে হয়েছিল। ওই প্রাণীটার ছোট ছোট পা, ভারী শরীর দেখেই মনে হচ্ছিল এদের ধরা খুব সহজ। হয়তো কিছুদিনের মধ্যে রিয়াও বিলুপ্ত হয়ে যাবে, পরিবেশের সঙ্গে মানাতে না পেরে। কিন্তু ওরই গোত্রের আরেকটা প্রাণী অস্ট্রিচ হয়তো টিকে থাকবে। পুন্টা অ্যান্টায় প্রচুর ফসিল দেখেছিলাম। নানান টাইপের প্রাণীর। ক্যাপিবেরা, অ্যাগাউটি—যে গোত্রের প্রাণী, সেরকমই টেপির শ্রেণির একটা প্রাণীর ফসিল পেলাম। এরা কি

পরিবেশের সঙ্গে মানতে পারেনি বলে প্রকৃতির খেলায় বাতিল হয়ে গেছে?

আমি এখন জাহাজের মধ্যে আমার কামরায় বসে ডায়েরি লিখছি। জাহাজের বাকি অফিসাররা বাইরের ডেকে আগুন ঘিরে বসে আছে। মাঝেমধ্যে আমরা ঘণ্টার পর ঘণ্টা কথা না বলে বসে থাকি। পাঁচ বছরে যা হয় আর কী! একই কথা নানান মোড়কে, নানান রংচঙ মাখিয়ে বলেও শেষ হয়ে গেছে। তবে এ ক'বছরে আমার যা অভিজ্ঞতা হয়েছে তার কথা বলেই সারাজীবন কাটিয়ে দিতে পারি। জাহাজে এসেছিলাম ফিৎজরয়কে সঙ্গ দিতে, তখন বুঝিনি যে এই জীবজগতের প্রতি আমার এত আগ্রহ আছে! যত দেখছি তত আগ্রহ বাড়ছে। মনে হচ্ছে যেন এক অজানা রহস্যের কিনারায় দাঁড়িয়ে আছি।

এই যেমন পুমা। পুমা আসলে একধরনের সিংহ। মূলত দক্ষিণ আমেরিকায় পুমা দেখা যায়। নিরক্ষরেখার উষ্ণ বনাঞ্চলেও যেমন এদের দেখা যায়, তেমনই আবার দেখা যায় টিয়েরা-ডেল-ফুয়েগোর মতো ঠান্ডা হাড়-কাঁপানো জায়গাতেও। সমতলেও যেমন দেখেছি, তেমনি এদের পায়ের ছাপ দেখেছি চিলির কার্ডিয়েলাতে দশহাজার ফুট উঁচুতে। ল্যা-প্লাডাতে পুমার শিকার হয়

হরিণ, অস্ট্রিচের মতো প্রাণীরা। মানুষের ওপর এরা কখনও আক্রমণ করে না। কিন্তু চিলিতে যেহেতু হরিণ, অস্ট্রিচ মেলা ভার, তাই সেখানে ওদের মেন ডায়েট মানুষ। প্রত্যেক জায়গায় পুমার চেহারা আলাদা, ব্যবহার আলাদা। যেন একই প্রজাতির আরেকটা প্রাণী। কচ্ছপগুলোরও তাই। প্রত্যেকটার খোলসের রং একদ্বীপ থেকে অন্যদ্বীপে আলাদা—সে দ্বীপের সঙ্গে রং মিলিয়ে।

আমার চোখের রং নীল। শুনেছি আগে ইংল্যান্ডে নীলচে চোখের লোক খুঁজে পাওয়া শক্ত ছিল। এখন সংখ্যাটা বাড়ছে। এটা কি এ জন্যই যে নীলচে চোখ বেশি আকর্ষক, আর তাই এটা সঠিক পরিবর্তন!

ডায়েরি লেখার কাজে বাধা আসছে। ডেকে হল্লা হচ্ছে। আজ ওদের মদ্যপানটা কি একটু বেশিই হয়ে গেছে? দেখে আসি তো কী ব্যাপার। আজকের লেখা এখানেই ইতি।

23 অক্টোবর, রাত একটা, 1835

ভারী অদ্ভুত এই দ্বীপটা। না দেখলে আমাদের পুরো যাত্রাই বিফল হত। এই দ্বীপে আসার কিন্তু কোনও

প্ল্যান ছিল না। ডেকে চিৎকার চেঁচামেচি হচ্ছে শুনে ওপরে উঠে আসি। দেখি একটা অদ্ভুত প্রাণী জালে ধরা পড়েছে। দেখতে অনেকটা ডলফিনের মতো। কিন্তু রং উজ্জ্বল লাল। ডানার পাশ থেকে হাতের মতো কিছু একটা বেরিয়ে আছে। ডাঙায় হাঁটার সময় হয়তো সেটায় ভর করে হাঁটে। সবথেকে আশ্চর্য, আমরা যে ওকে ধরেছি—ওর কোনও ক্ষতি করতে পারি, এমন কোনও ভয়ডরই ওর মধ্যে নেই। জাল থেকে বের করার পর দিব্যি আনন্দে আমাদের মধ্যে ঘুরে ফিরে বেড়াতে লাগল। হাত থেকে খাবার নিতে থাকল। এরকম কোনও জীবের অস্তিত্বের কথা আমাদের কারোরই জানা নেই। এটাকে ধরে রিচার্ডের কাছে পাঠালে ও নির্ঘাত শক্ত একটা নাম দিয়ে বসবে। আমি ওটাকে ডলফিন-ই বলব।

আমরা গল্প করছি—হঠাৎ ডলফিনটা ঝড়ের বেগে রেলিং-এর দিকে এগিয়ে গিয়ে জাহাজ থেকে জলে ঝাঁপ দিল। ঘটনাটার জন্য আমরা একদমই প্রস্তুত ছিলাম না। ছুটে রেলিং-এর ধারে গিয়ে দেখি ওরই মতো আরও দুটো ডলফিন। ওটা গিয়ে ওই দলে ভিড়ে গেছে। আর উত্তর-পশ্চিম দিকে ডলফিনোচিত ভঙ্গিতে সাঁতরে যাচ্ছে।

আমরা ওর পিছু নিলাম। একটু অ্যাডভেঞ্চার আর কি! মিনিটদশেক বাদে দেখি আমরা অজানা একটা দ্বীপের দিকে এগোচ্ছি। দূর থেকে তার তটরেখা দেখা যাচ্ছে। ম্যাপে এই দ্বীপটার কোনও চিহ্ন নেই। দ্বীপটা পাহাড় দিয়ে ঘেরা। সামান্য তট। তারপর সমুদ্র থেকে সোজা ওপরে উঠে গেছে। সমুদ্রের নীচে আগ্নেয়গিরি জেগে উঠে এরকম ভূখণ্ড সৃষ্টি করে। হয়তো এ দ্বীপটাও বেশি পুরোনো নয়।

দ্বীপের ধার দিয়ে বেশ খানিকটা ঘোরার পর খানিকটা সমতল তটভূমির সন্ধান পাওয়া গেল। এখান দিয়ে হেঁটে দ্বীপের মধ্যে ঢোকা যাবে। জাহাজ নোঙর করে আমরা ভেতরের দিকে হাঁটতে শুরু করলাম। গাছগাছালির মধ্যে দিয়ে হাঁটার সময় লক্ষ করলাম যে এখানকার গাছগুলো ভিন্ন প্রজাতির। সব গাছেই কেমন একটা অদ্ভুত বুনো গন্ধ। খুব তীব্র পারফিউমের মতো। পথে কয়েকটা ছোট লেক পড়ল। বিশ্রাম নেওয়ার জন্য একটা লেকের ধারে গিয়ে বসলাম।

বেশ খানিকক্ষণ হয়ে গেল। দ্বীপটার মধ্যে কিন্তু কোনও জীবজন্তুর দেখা পেলাম না। প্রাণহীন দ্বীপ না কি? ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ দেখি ঝোপের মধ্যে

থেকে একটা হরিণ শ্রেণির প্রাণী বেরিয়ে জলাশয়ের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। হরিণ শ্রেণির বলছি, কারণ হরিণের মতো রং নয়। গাঢ় নীল। আমি প্রাণীটার দিকে এগিয়ে গেলাম। আরও কাছ থেকে দেখব বলে। কিন্তু আমাকে দেখে ও বিন্দুমাত্র ভ্রূক্ষেপ করল না। উলটে মুখ তুলে আমাকে দেখতে লাগল। এই অদ্ভুত রঙের জন্য ও খুব সহজেই অন্য প্রাণীর শিকার হয়ে উঠতে পারে।

সব জায়গাতেই কিছু লোক থাকে যারা বুদ্ধি-বিবেচনা দিয়ে কোনও কাজ করে না। ক্রিস ওরকমই একজন। হঠাৎ করে ছুটে এসে প্রাণীটাকে গাছের ডাল নিয়ে তাড়া করল। অবশ্য তাড়া করায় ভালোই হল। আরেকটা জিনিস দেখতে পেলাম। দেখলাম, এই প্রাণীটার সঙ্গে হরিণের আরেকটা তফাত হল এটা হরিণের দশভাগের একভাগ বেগেও ছুটতে পারে না।

আমরা ঠিক করলাম, জাহাজে না ফিরে তাঁবু খাটিয়ে দ্বীপেই রাত কাটাব। তেমন হিংস্র কোনও জানোয়ার এই দ্বীপে আছে বলে মনে হয় না। আর থাকলেও আত্মরক্ষার জন্য অনেক অস্ত্র আমাদের কাছে আছে।

রাতে খাওয়ার পর আগুন জ্বালিয়ে তাঁবুর বাইরে

এসে বসলাম। কী অপূর্ব এই দ্বীপ। পাহাড়-হ্রদ-সমুদ্র, সবুজে ঢাকা উপত্যকা—কী নেই এই দ্বীপে। কেউ যেন পৃথিবীর সব সৌন্দর্য এক জায়গায় এনে জড়ো করেছে।

কিন্তু এত সুন্দর হওয়া সত্ত্বেও কিছু একটার যেন অভাব আছে। তাই বোধহয় সামনের পাইনের বনে ঝাঁপিয়ে পড়া চাঁদের আলো দেখেও মন খারাপ লাগছিল। নুইয়ে পড়া উইলো গাছের পাতায় যেন কীসের বিষণ্নতা। শন্‌শন্‌ বাতাসে যেন শোনা যাচ্ছে ম্যাপল পাতার কান্না।

পাঁচ বছর হল বাড়ি ছেড়ে বেরিয়েছি। বাবা-দাদা কে কেমন আছেন কিছুই খবর পাইনি। কী লাভ হয়েছে এই পাঁচ বছর জাহাজে করে দেশ-বিদেশ ঘুরে। নানান ধরনের জীবজন্তু, গাছপালা আর জীবাশ্মের সন্ধানে জীবনের কয়েকটা মূল্যবান বছর হারিয়ে বসে আছি। জীবজগতের এই সৃষ্টির রহস্য ভেদ করার ক্ষমতা আর যারই থাকুক না কেন, এটুকু বুঝেছি আমার নেই। এর থেকে ভালো ছিল গ্রামে গিয়ে প্রিস্ট হওয়া। বাবার কথা মতো না এলেই ভালো করতাম।

আমার পাশে বসে আছে কেন ডারিংটন। চুলে ঝুঁটি বাঁধা। বেশ শক্তপোক্ত চেহারা। জাহাজের কলকবজা

খুব ভালো বোঝে। মেনটেনান্সের জন্য ওকে নিয়ে আসা হয়েছে। সারাক্ষণ হইচই করতে ভালোবাসে। তা সে-ও দেখছি মনমরা হয়ে বসে আছে। দু-একটা কথা বলার চেষ্টা করলাম। হুঁ-হাঁ বলে কাটিয়ে গেল। বুঝলাম ওর মনের অবস্থা ভালো নেই।

এরমধ্যে খানিকক্ষণ ধরে একটা মস্‌মস্‌ আওয়াজ শুরু হয়েছে। মাঝে মাঝে পাচ্ছি, মাঝে মাঝে হারিয়ে যাচ্ছে। হঠাৎ কেন্‌-ই আবিষ্কার করল—শজারু। আমার ঠিক দু-ফুট দূরে নির্ভয়ে বসে আছে। ভয় অবশ্য আমারই পাওয়ার কথা। কাঁটা ফুটলে আর দেখতে হবে না। কিন্তু সতর্ক হওয়ার আগেই ঘটনাটা ঘটে গেল। আমার অবশ্য নয়, কেন্‌-এর। কেন্‌ কী একটা ফল খাচ্ছিল। তারই আকর্ষণে কি না জানি না, হঠাৎ করে শজারুটা কেন্‌-এর গা ঘেঁষে বসল। কেন্‌-ও চমকে উঠেছিল। কিন্তু এবার আমার চমকে ওঠার পালা। কেন্‌ শজারুটাকে কোলে তুলে দিব্যি আদর করছে। খানিকবাদে নিস্তব্ধতা ভেঙে ও বলে উঠল,—ডারউইন, হাত দিতে পারো। এটা শজারু নয়, এর কাঁটাগুলো একেবারে নরম। হাত দিলে বেশ আরাম হয়।

একটু দ্বিধা নিয়ে কেন্‌-এর কথা মতো শজারুটার

গায়ে হাত দিলাম। আশ্চর্য কাঁটাগুলো শজারুর মতো শক্তও নয়, বিঁধেও যায় না। খুব নরম, লম্বা লম্বা রোমের ওপর হাত দিলে যেমন লাগে সেরকম। আর প্রাণীটাও সত্যি অদ্ভুত। এর কোনও ভয়ডর নেই। দিব্যি নিশ্চিন্তে আমাদের মাঝখানে বসে রইল। যেন আমাদের পোষা, সান্নিধ্য উপভোগ করছে।

রাত বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে হাওয়াটা বাড়ছে। তাঁবুর ভিতর ঢুকে তাই মোমবাতির আলোয় ডায়েরি লিখতে বসেছি। খানিকক্ষণ ধরে মনের মধ্যে যে ভাবনাটা শুরু হয়েছে সেটা আর আজকে লিখলাম না। কাল দেখা যাবে সেটা নেহাতই অমূলক কি না।

25 অক্টোবর, 1835

গত দুদিনের মধ্যে অনেক কিছু ঘটে গেল। জানি না, আমিও এই দ্বীপ ছেড়ে বেরোতে পারব কি না! নাকি আমার অবস্থাও কেন্, রোজ, জন, ডেভ-এর মতো হতে চলেছে।

শুরু করা যাক কাল সকাল থেকে। পরশু রাতে কেন্-এর নাকডাকা ছাড়া আর কোনও ঘটনা ঘটেনি। শজারু শ্রেণির প্রাণীটাও আমাদের তাঁবুর মধ্যে এসে

শুয়েছিল। সকালে ঘুম ভেঙে দেখি কোথায় চলে গেছে।

আরেকটু পরে আমরা দ্বীপের মধ্যে ঘুরতে বেরোলাম। দ্বীপের আরও ভেতরের দিকে। গাছ থেকে যে গন্ধটা পাচ্ছিলাম, সেটা যেন আরও তীব্র হচ্ছে। এখানকার আবহাওয়া ট্রপিকাল হলেও যে জঙ্গলটায় ঢুকলাম তার সঙ্গে ট্রপিকাল ফরেস্টের তেমন মিল নেই। পাইন, ওক, দেবদারুর মতো শীতপ্রধান জায়গার গাছের ভিড়। আরও বেশ কিছু অজানা-অচেনা গাছ। একটা গাছ দেখে আখরোট বলে মনে হল। সেরকমই বড় বড় পাতা। কিন্তু কাছাকাছি যেতেই দেখলাম হঠাৎ গাছের পাতাগুলো গুটিয়ে গেল। আমরা যেভাবে হাতের পাতা গুটিয়ে নিই ঠিক সেভাবে। বেশিরভাগ গাছই ন্যাড়া ন্যাড়া মতন। পাতা খুব কম। শুধু ডালপালা ছড়িয়ে নির্জীবভাবে দাঁড়িয়ে আছে।

বেশ কিছুক্ষণ বাদে একটা সাপ চোখে পড়ল। নেতিয়ে মাটিতে পড়ে আছে। কিং কোবরা। সাপের রাজাকে এরকম নিস্পৃহভাবে পড়ে থাকতে দেখা যায় না। লাঠি দিয়ে খোঁচা দিতেও ফণা তুলল না। আস্তে আস্তে ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ল। অসুস্থ হবে হয়তো।

ওদিকে ডেভ চেঁচিয়ে উঠল—লাল ইঁদুর!

ওর আঙুল লক্ষ করে তাকিয়ে দেখলাম, সত্যিই তাই। সাপটার থেকে হাতদুয়েক দূরে টকটকে লাল রঙের ইঁদুর। শিকার ও শিকারির এভাবে পাশাপাশি বসে থাকা কল্পনা করা যায় না। যেন দুজনেই কোনও গভীর চিন্তায় নিমগ্ন। আর জীবনের সব আগ্রহ যেন হারিয়ে ফেলেছে।

আমার মাথার মধ্যে সব চিন্তাধারা কীরকম জট পাকিয়ে যাচ্ছিল। তাহলে কি আমার এতদিনের পরিশ্রম, চিন্তাভাবনা—সবই কি ভুল? বিভিন্ন দেশের অজস্র জীবজন্তু উদ্ভিদশ্রেণি দেখে আমি সিদ্ধান্তে আসতে চলেছিলাম যে, প্রত্যেক জীব তার জীবনধারণের জন্য পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিজের মধ্যে পরিবর্তন ঘটায়। সেই পরিবর্তন ঠিক দিকে হলে সেই জীব এই জীবজগতে টিঁকে যায়। না হলে বিলুপ্ত হয়ে যায়। একেক দেশের পুমার চেহারা তাই একেকরকম। হার্মিং বার্ড একেকরকম। কিন্তু এখানে যেন সবকিছুই অন্যরকম। কারও কোনও আত্মরক্ষার অস্ত্রই নেই। এখানকার শজারুর না আছে কাঁটা। হরিণের না আছে গতি। তবু তারা কীভাবে যে জীবন সংগ্রামে টিকে আছে, সেটাই আশ্চর্য।

এসব ভাবতে ভাবতে হাঁটতে থাকলাম। খানিকবাদে উপত্যকার মতো একটা জায়গায় এসে পৌঁছোলাম। জায়গাটা থেকে চারদিকে বেশ কয়েকটা পাহাড় উঠে গেছে। একটা কম-খাড়া পাহাড়ের গা বেয়ে ওপরে উঠতে লাগলাম।

খানিকটা ওঠার পর গাছের ভিড় আরও কমে গেল। আমরা ওই পাহাড়ের প্রায় ওপরে উঠে গেছি। দ্বীপের বেশ খানিকটা জায়গা এখান থেকে দেখা যায়। সবুজ বনভূমির মধ্যে ছড়িয়ে থাকা লেকগুলো ওপর থেকে দারুণ লাগছে। মুগ্ধ হয়ে দেখছি।

এরই মধ্যে হঠাৎ বন্দুকের আওয়াজ পেলাম। একবার নয়, তিন-তিনবার। ঘাবড়ে গিয়ে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি জনের রাইফেলের নল থেকে তখনও ধোঁয়া বেরোচ্ছে। ওর থেকে মোটামুটি কুড়ি হাত দূরে একটা চিতাবাঘ মরে পড়ে আছে। চিতাবাঘটা নাকি পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে আস্তে আস্তে আমাদের দিকেই আসছিল। এগিয়ে গিয়ে চিতাবাঘটাকে কাছ থেকে দেখলাম। অদ্ভুত! এর পায়ের পেশি দেখলে মনে হয় না যে এগাছ বেয়ে উঠতে পারে। খুব জোরে ছুটতে পারে বলেও মনে হল না। শরীরের গঠন সেরকমভাবে গড়ে ওঠেনি।

চিতাবাঘটা যেদিক দিয়ে এসেছিল, আমরা ঝোপ সরাতে সরাতে সেদিকে এগোতে লাগলাম। খানিকটা এগোবার পরে আরেকটা ফাঁকা জায়গায় এসে পৌঁছোলাম। চারদিকে বেশ কিছু প্রাণীর কঙ্কাল পড়ে আছে। একটু দেখেই বুঝতে পারলাম যে এগুলো অন্য কোনও প্রাণীর নয়, চিতাবাঘেরই। কী ব্যাপার! এখানে কি কোনও দাবানল লেগেছিল? চারদিকের গাছ-মাটি দেখে তো সেরকম মনে হচ্ছে না, তাহলে কি আরও শক্তিশালী কোনও প্রাণীর শিকার হয়েছে এরা?

বেলা অনেক হয়ে গেছে। সবার খিদেও পেয়েছে খুব। তাই তাঁবুর উদ্দেশ্যে ফিরতে শুরু করলাম। তাঁবুতে ফিরে দুপুরের খাওয়া সারা হল। একটা আর্মাডিলো ধরা হয়েছে। খোলসসুদ্ধ রোস্ট করা হয়েছিল। প্রথম দিকে আর্মাডিলোর মাংস খেতে জঘন্য লাগত। কীরকম একটা বিদ্‌ঘুটে গন্ধ। এখন অভ্যেস হয়ে গেছে।

খাওয়ার পরে বিশ্রাম না নিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লাম। একটু অন্যদিকে। সবাই খুব হতোদ্যম। বেরোনোর আর উৎসাহ নেই। তাই একাই বেরোতে হল। রাইফেলটা সঙ্গে নিয়ে নিলাম।

বনের মধ্যে দিয়ে ঘণ্টাখানেক হাঁটার পর একটা

হথহর্ন গাছের তলায় বিশ্রাম নিতে বসলাম। গাছের সেই বিদঘুটে গন্ধটা মনকে কেমন অবসন্ন করে দিচ্ছে। জীবনকে সেই মুহূর্তে এতটাই অর্থহীন মনে হল যে সেই গাছের তলাতেই বসে রইলাম।

বোধহয় ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। যখন ঘুম ভাঙল, তখন সন্ধে হয়ে গেছে। অন্য সময় হলে হয়তো ভয় পেয়ে যেতাম। একা এই অচেনা বনে রাত কাটানো। কিন্তু তখন সেই ভয়ও নেই। শরীর যেন অসাড় হয়ে গেছে। নেহাত মনের জোরে উঠে দাঁড়ালাম। রওনা হলাম তাঁবুর উদ্দেশ্যে। কিন্তু চাঁদের আলোতে এই বনানীর মধ্যে দিয়ে পথ খুঁজে পেলাম না। ঘণ্টাখানেক এদিক-ওদিক ঘোরার পরে বুঝলাম যে পথ হারিয়েছি। সকাল হওয়ার আগে ফেরার চেষ্টা বৃথা।

জঙ্গলের মধ্যে রাত না কাটিয়ে একটু খোলা জায়গায় থাকা ভালো। তারই সন্ধানে এগোতে গিয়ে মনে হল, দূরে যেন আলো দেখা যাচ্ছে। খানিকক্ষণ এগোনোর পর যে দৃশ্যটা দেখতে পেলাম তা লিখে বোঝানো মুশকিল। খানিক দূরে একটা লেক দেখা যাচ্ছে, আর সেই লেকের ধারে প্রায় জনা তিরিশ লোক জড়ো হয়েছে। দেখতে অনেকটা আমাদেরই মতন, হাতদুটো আরেকটু লম্বা। মুখটা ছোট, কিন্তু

চওড়া। গায়ের রং কালো নয়, ফরসার দিকেই বলা যেতে পারে।

ওদের মধ্যে কোনও প্রতিযোগিতা জাতীয় কিছু একটা হচ্ছে বলে মনে হল। বেশ কয়েকটা একই ধরনের ছোট ছোট কাঠ পাশাপাশি মাটিতে রাখা আছে। এক এক করে জনাদশেক লোক এসে যে যার মতো কাঠ নির্বাচন করল। তারপর কাঠে কাঠে ঘষে আগুন জ্বালানোর চেষ্টা করতে লাগল। একজনকে হঠাৎ খুব উত্তেজিত মনে হল। বোধহয় সে-ই সবথেকে আগে আগুন জ্বেলেছে। একজন নেতা গোছের লোক এসে সেই লোকটার গলায় ছোট কাঠের টুকরো দিয়ে বোনা একটা মালা পরিয়ে দিল।

লেকের ধারে এক জায়গায় বেশ কিছু কাঠ জড়ো করে চিতার মতো করা ছিল। লোকটা গিয়ে শুয়ে পড়ল তার ওপর। কয়েকটা লোক লতাপাতা দিয়ে লোকটাকে আষ্টেপৃষ্ঠে কাঠের সঙ্গে বাঁধল। আরও কিছু কাঠ চাপানো হল। কী হতে চলেছে বুঝতে পারছি না। এবার একটা মেয়ে এসে ওই কাঠের ওপর কী একটা তরল ছড়িয়ে আগুন লাগানোর চেষ্টা শুরু করল।

কী হতে চলেছে? পুরস্কার হিসেবে এ লোকটাকে

জীবন্ত আগুনে পোড়ানো হচ্ছে? এখানে কি তবে মৃত্যুটাই পুরস্কার? সবাই কি এখানে মরতে চায়।

এসব ভাবছি, ইতিমধ্যে আগুন জ্বলে উঠল। মেয়ে-পুরুষ সবাই মিলে মন্ত্র জাতীয় কিছু একটা বলতে লাগল। মন্ত্র পড়া হয়ে গেলে সবাই গোল হয়ে আগুনটাকে ঘিরে বসল। কারও মুখে কোনও কথা নেই, হাসি নেই। এ এক অদ্ভুত সভা। আমিও যে কতক্ষণ বসেছিলাম কে জানে!

সকাল হতে ওই লোকগুলো উলটো দিকের বনের মধ্যে ঢুকে গেল। আমাকেও আশা করি ওরা দেখতে পেয়েছিল। কিন্তু সে ব্যাপারে বিন্দুমাত্র আগ্রহ প্রকাশ করল না।

ওদের সম্বন্ধে আরও জানা দরকার। কিন্তু আশ্চর্য, উৎসাহ পেলাম না। মনে হল, এখানেই বসে থাকি। জীবনের বাকি সময়টা যেন এখানে বসেই কাটিয়ে দেওয়া যায়।

আরও ঘণ্টাখানেক পরে জোর করে উঠে দাঁড়ালাম। খিদে পেয়েছে, ফিরতেই হবে। গাছের ডাল ভেঙে ভেঙে আসার সময় চিহ্ন রেখেছিলাম। সেরকম একটা গাছ খুঁজে পেতেই ফেরাটা সহজ হয়ে গেল। ফিরতে ফিরতে আরও একঘণ্টা হয়ে গেল। পরপর অনেকগুলো

তাঁবু। আমাকে দেখেই ক্যাপ্টেন ফিৎজ্‌রয় একটা তাঁবু থেকে বেরিয়ে এল,—কাল রাতে কোথায় ছিলে ডারউইন? আমি প্রচণ্ড চিন্তায় পড়ে গিয়েছিলাম। ভাবছিলাম তোমার অবস্থাও কেন্ আর ডেভের মতো হল কি না।

একটু থেমে ফিৎজ্‌রয় ফের বলে উঠল, না, না, এ দ্বীপে আর নয়। যত তাড়াতাড়ি সম্ভব বেরিয়ে পড়ব। সবাই কীরকম নিস্তেজ হয়ে পড়েছে।

—কেন্, ডেভের কী হয়েছে?

—শুধু কেন্, ডেভ? কাল সন্ধে থেকে তোমাকে নিয়ে সবসুদ্ধ আটজন নিখোঁজ। রাত আটটা নাগাদ তোমরা কেউ ফিরলে না দেখে আমরা মশাল নিয়ে বেরোলাম। কাল দুপুরে যেদিকে গিয়েছিলাম, সেদিকেই তোমাদের যাওয়ার সম্ভাবনা বেশি বলে এগোলাম। কালকে আমরা যতদূর গিয়েছিলাম তার থেকে আরও ঘণ্টাখানেক এগিয়ে গেলাম। আরেকটা ছোট টিলা মতন পাহাড় পথে পড়ল। সেটা বেয়ে ওপরে উঠলাম। পাহাড়টা বেশ ন্যাড়া। গাছ নেই বললেই চলে। তাই দূর থেকে হঠাৎ কেন্ আর ডেভকে দেখতে পেলাম। ওরা দুজনেই বিপজ্জনকভাবে পাহাড়ের প্রান্তের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে। ছুটে গিয়ে কেন্‌কে ধরে

ফেললেও ডেভকে ধরতে পারিনি। তার আগেই নীচে ঝাঁপ দিয়েছে। ওর কোনও চিহ্নই নেই। খাড়া পাহাড়টার নীচের দিকে জঙ্গল। কেন্-এর তখনও ঘোর কাটেনি। বারবার বলে চলেছে,—আমি মরতে চাই, আমি মরতে চাই।

কালকের পর থেকে এখনও অবধি ওর একই অবস্থা চলছে। পাতার রস খাইয়ে ঘুম পাড়িয়ে রাখা হয়েছে।

—আর ডেভ?

—আমরা পাহাড় থেকে নেমে ঘণ্টাখানেক বাদে ওই জঙ্গলের মধ্যে ঢুকলাম। ডেভের মৃতদেহ পেলাম না, তবে যা দেখলাম তা বিস্ময়কর। চারদিকে হাজার হাজার কঙ্কাল ছড়িয়ে আছে। দেখেই বোঝা যায় এরাও প্রত্যেকে পাহাড়ের ওপর থেকে ঝাঁপ দিয়েছে। কত ধরনের প্রাণীর কঙ্কাল যে ছড়িয়ে আছে তা বলে বোঝানো যাবে না। কিছু কিছু কঙ্কাল তো আমার পরিচিত সব প্রাণীর চেয়ে অনেক বড় চেহারার প্রাণীর বলে মনে হল। মনে হল ওই জায়গাটা সবাই সুইসাইড স্পট হিসেবে ব্যবহার করে। ওখান থেকে আমরা সোজা ফিরে এলাম। রাত অনেক হয়ে গিয়েছিল। সবাই ক্লান্ত-অবসন্ন। সবার মন খারাপ। বাকিদের

খোঁজ এখনও পাইনি।...তা তোমার কী খবর?

আমিও আমার রাতের অভিজ্ঞতা ফিৎজ্‌রয়কে খুলে বললাম।

—আমার মনে হয়, এই দ্বীপের পরিবেশে এমন কিছু আছে, যার জন্য এখানকার জীবজন্তুদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা খুব বেশি। হয়তো তাঁরা বেঁচে থাকার আগ্রহই হারিয়ে ফেলে। আরেকটা জিনিসও লক্ষ করার মতো। এ দ্বীপের গাছ, পশুপাখি পৃথিবীর বাকি যে-কোনও জায়গার থেকে একদম অন্যরকম। আমার মনে হয় এ দ্বীপে বেশ কিছুদিন থেকে এখানকার জীবজন্তুদের স্টাডি করা দরকার।

আমার কথা থামিয়ে ক্যাপ্টেন অসহিষ্ণুভাবে বলে উঠল,—ডারউইন, তোমার মতো শুধু রিসার্চ করতে আমি আসিনি। আমার দায়িত্ব হচ্ছে কোস্ট সার্ভে করে আমার সহযাত্রীদের সাবধানে দেশে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া। তাই আমার ইচ্ছে কালকেই এ দ্বীপ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ব। কাল সকালেই। সবাইকে আমি এই দ্বীপে হারাতে চাই না। মনে রেখো প্রত্যেকটা মৃত্যুর জন্য আমাকে কৈফিয়ৎ দিতে হবে।

ক্যাপ্টেনের সঙ্গে কথা বলার পরে আমরা বাকি পাঁচজনের খোঁজে বেরোলাম। দ্বীপের বেশ কিছু

জায়গা একেবারে দুর্গম। দিনের শেষে আমরা যখন ফিরে এলাম তখন ওই পাঁচজনের খোঁজ তো পাওয়াই যায়নি, উলটে আরেকজন খালাসিকেও শুনলাম সকাল থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। সে-ও নিখোঁজ।

সত্যিই এ অভিশপ্ত দ্বীপে আর থাকা উচিত হবে না। অন্তত সব সহযাত্রীর ঝিমিয়ে পড়া অবস্থা দেখে তাই মনে হচ্ছে।

জীবজগতের মধ্যে পরিবেশের সঙ্গে খাপ-খাওয়ানোর জন্য যুগ যুগ ধরে পরিবর্তন হয়। এই পরিবর্তন জীবের অস্তিত্ব রক্ষার জন্য আবশ্যক। পরিবেশের সঙ্গে সেভাবে খাপ-খাওয়াতে না পারলে সেই জীব হারিয়ে যায়, বিলুপ্ত হয়। খালি শক্তিমানেরাই টিঁকে যায়। কিন্তু এই দ্বীপ সব দিক দিয়েই ব্যতিক্রম। তার কারণ, এ দ্বীপের প্রত্যেকটা জীব মৃত্যুর জন্য উন্মুখ হয়ে অপেক্ষা করে। অভিশপ্ত জীবন তাড়াতাড়ি শেষ হয়ে যাক, এই কামনা করে। তাই কোনও জীবনসংগ্রাম নেই, কোনও প্রতিযোগিতা নেই, লড়ে বেঁচে থাকার তাগিদ নেই। এধরনের পরিবেশে কী দরকার অভিযোজনের? কী দরকার পরিবেশের সঙ্গে খাপ খাওয়ানোর? তাই এখানে শক্তিমানেরা হারিয়ে যায়। তারা আত্মঘাতী হয়। পড়ে থাকে তারাই—যারা দুর্বল, যারা নিরীহ।

কাল আরও ক'টা প্রাণী দেখতে পেলে ভালো হয়। আজ এখানেই রাখি। হাত যেন আর চলছে না।

পল পড়া থামাল।

—ব্যস, এখানেই শেষ? অনিলিখা বলে ওঠে।

—হ্যাঁ, এরপরে আর কিছু নেই।

—তা, তার পরের কয়েকদিনে কী হয়েছিল, কী দেখেছিল—কিছুই তো লেখেননি!

—আমার মনে হয় ওরা তার পরদিনই ওই দ্বীপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল। তারপর এই শক্ কাটাতে ওনার সময় লেগেছিল। এতজন সতীর্থের মৃত্যু। খবর বেরোলে ক্যাপ্টেন ফিৎজ্‌রয় অস্বস্তিতে পড়ে যেত। প্রশ্ন উঠত কেন প্রয়োজনীয় সাবধানতা নেওয়া হয়নি। তবে এ দ্বীপের ঘটনায় ডারউইন নিজেই যে তার থিয়োরি সম্বন্ধে কন্‌ফিউস্‌ড হয়ে গিয়েছিল তা নিশ্চিত। তা না হলে, বিগ্‌ল যাত্রার 23 বছর বাদে 1859 সালে ডারউইন 'অরিজিন অব স্পিসিস বাই মিন্‌স অফ ন্যাচারাল সিলেকশান' লিখবেন কেন? ফেরার দু-এক বছরের মধ্যেই লিখতে পারতেন। 23 বছর অপেক্ষার কী কারণ থাকতে পারে?

—তা আমরা যে যাব, দ্বীপটা ঠিক কোন দ্বীপ তা বোঝা যাবে তো?

—হ্যাঁ, সেসব ইনফরমেশন আমি ইতিমধ্যেই জোগাড় করে নিয়েছি। এটা 0^0 অক্ষাংশ—91^0 পশ্চিম দ্রাঘিমাংশে। আমার প্লেনের জিপিএস ভুল করবে না। চলো এখন রেস্ট নেওয়া যাক। কাল থেকে নেক্সট কয়েকদিন যথেষ্ট পরিশ্রম হবে।

স্টাডিরুমের দেওয়ালে পরপর বেশ কয়েকটা ছবি। দাড়িওয়ালা গোলফ্রেমের চশমা পরা এক প্রফেসার সুলভ ছবি দেখিয়ে পল বলে ওঠে—ইনিই রিচার্ড আওয়েন। ডারউইনের যাবতীয় কৃতিত্বের অন্তত পঞ্চাশভাগ এনার পাওয়া উচিত ছিল। কিন্তু কিছুই পাননি। দেখি ওনার বংশধর হয়ে এ দ্বীপ আবিষ্কার করে কিছুটা স্বীকৃতি যদি পাওয়া যায়।

বাকি ছবিগুলো দেখে পল আর অনিলিখা খানিকবাদে স্টাডিরুম থেকে বেরিয়ে আসে।

25 মে, 2012

সানফ্রান্সিসকো থেকে প্লেনে বারো-তেরো ঘণ্টার যাত্রা। ভোর পাঁচটায় বেরোলেও ওই দ্বীপে পৌঁছোতে অনিলিখাদের সন্ধে হয়ে গেল। দ্বীপটা খুঁজতে অবশ্য বেশি সময় লাগেনি। স্যাটেলাইটের দৌলতে দ্বীপ খোঁজা এখন খুব সোজা।



তবে শক্ত কাজ ছিল প্লেনটা ল্যান্ড করানো। ছোট প্লেন হলেও ল্যান্ডিং-এর ঠিকমতো জায়গা পাওয়া যাচ্ছিল না। দ্বিতীয় বারের চেষ্টায় মাইক নিখুঁতভাবে প্লেন নামাল চরের ওপরে। মাইক হল পলের পাইলট। আফ্রিকান। তবে ওদের দুই পুরুষ আমেরিকায় থাকে। রং কুচকুচে কালো। মাঝবয়সি। চোখের নীচটা খানিকটা বসা মতো। ভোঁতা নাক। চোখে-মুখে হিংস্রতার ছাপ। একটু জোরে চেঁচিয়ে কথা বলে। মাইক দ্বীপের ভিতরে ঢুকবে না। ঢুকবে রবার্ট, পল আর অনিলিখা। প্লেনেই রবার্টের সঙ্গে অনিলিখার পরিচয় করে দিয়েছে পল। রবার্ট শিকারি। এরকম বেশ কিছু শিকারে যাওয়ার অভিজ্ঞতা ওর আছে। কথা খুব কম বলে। পল ওর পরিচয় দেওয়ার পর রবার্ট কি একটা বলতে গিয়ে থেমে গেল।

সন্ধে হয়ে গেছে বলে ওরা সে রাতের মতো চরেই তাঁবু করে নিল। পল অনেক ক্যান্ড ফুড এনেছে। স্যুপ, সেদ্ধমাংস, কাটা ফল, সবই আছে। তা ছাড়া আছে একটা ফোল্ডিং ইউটিলিটি সেন্টার, যাতে রান্নার যাবতীয় সরঞ্জাম—মাইক্রোয়েভ, ফ্রিজার, প্লেট, কাঁটাচামচ সবই আছে। অন্তত আগামী দশদিনে খাওয়ার কোনও অসুবিধে হবে না। এ দ্বীপে আসামাত্রই বুনো গন্ধটা ওরা টের পেয়েছে। অদ্ভুত একটা মন মাতানো গন্ধ। মনটাকে কেমন যেন অবসন্ন করে দেয়।

খেতে খেতে পলই বলে উঠল,—এ দ্বীপে আমরা কিন্তু

চার দিনের বেশি থাকব না। ডারউইনদের মতো অবস্থা না হয়। অনেক অ্যান্টিডিপ্রেসান্ট ট্যাবলেট নিয়ে এসেছি। রেগুলার খেতে হবে। সুইসাইড করার ইচ্ছে আবার না জেগে ওঠে।

—হ্যাঁ, ইতিমধ্যেই কীরকম নিস্তেজ লাগছে। অথচ কী সুন্দর আইল্যান্ডটা! তা চারদিনের মধ্যে কি ডেভিডকে খুঁজে পাওয়া যাবে? অনিলিখা বলে ওঠে।

—চারদিনে না পাওয়া গেলে দশদিনেও পাওয়া যাবে না।

—তা আমরা খুঁজব কীভাবে? কোনদিকে যাব?

—আমরা উত্তর-পশ্চিম দিক বরাবর যাব, ঠিক যেদিকে ডারউইন নিজে গিয়েছিলেন।

বলে পল কাগজে একটা ম্যাপ আঁকতে শুরু করল।

পলের হাতে ধরা মঁব্লা স্পেশাল এডিসন—নেপোলিয়ান কালেকশনের পেনটা দেখে অনিলিখা বলে ওঠে,—এটা ডেভিডের পেন না?

—কেন এ পেন কি শুধু ওর কাছেই থাকতে পারে? এটা আমার। একটু রেগেই যেন বলে উঠল পল। তারপর বলল, —একটা জিনিস শুধু মাথায় ঢুকছে না। এ দ্বীপটা আগে আবিষ্কৃত হয়নি কেন?

—হয়তো যারাই এ দ্বীপে আসে তাদেরই ডারউইনদের মতো অবস্থা হয়। বলেই অনিলিখা থেমে গেল। জঙ্গলের মধ্যে থেকে কার যেন আর্তচিৎকার ভেসে এল। রবার্ট আর

পল বন্দুক হাতে উঠে দাঁড়াল কিন্তু চাঁদের আলোর বাইরে কিছুই দেখা গেল না।

27 মে, 2012

দুদিন কেটে গেল। ডেভিডের কোনও খোঁজ পাওয়া যায়নি। তবে দ্বীপটা সম্বন্ধে ডারউইনের লেখা যে ঠিক সে ব্যাপারে অনিলিখা নিশ্চিত। অন্য দিক থেকে বলা যায়—এ দ্বীপটাই যে ডারউইনের দ্বীপ তা নিয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রথমত দ্বীপটায় প্রাণী নেই বললেই চলে। যা আছে তারা অন্যরকম। অন্তত যে-ক'টা প্রাণী এরমধ্যে চোখে পড়েছে তাদের দেখে তা-ই মনে হয়েছে। কালকেই যেমন—গাছ থেকে পড়া একটা নারকোল ওরা ভেঙে খেতে যাবে, দেখে গুটিগুটি পায়ে একটা অ্যাগাউটি এসে হাজির। এর রং মেটে নয়, সবুজ। অ্যাগাউটিটা নির্ভয়ে ওদের পাশে এসে দাঁড়িয়েছে। শুধু দাঁড়িয়েছে তা-ই না, চুপ করে দাঁড়িয়েই আছে, যেন ওকে নারকোলটা ভেঙে কেউ খেতে দেবে। অ্যাগাউটিরা কামড়ে নারকোল ভেঙে ফেলতে পারে। ওদের মতো এ ব্যাপারে এক্সপার্ট আর নেই। দেখা গেল, এটা তা পারে না, সেরকম শক্ত চোয়াল বা দাঁতই নেই। যাই হোক, অনিলিখাদের

বদান্যতায় এটা সামান্য একটু খেতে পারল। এমনিতে কী করে খায় কে জানে!

জঙ্গলের মধ্যে দিয়ে সরু একটা পথ উত্তর-পশ্চিম দিকে গেছে। মনে হয় এপথে যাতায়াত আছে। তবে গাছের ডালপালা কেটে কেটে এগোতে হচ্ছে। একটাই বাঁচোয়া, জঙ্গল খুব ঘন নয়। তা হলে এগোনো মুশকিল হত। নিরক্ষরেখার কাছাকাছি দ্বীপে যেমন ঘন বন হয়, এখানে সেরকম কিছু নেই। গাছেরাও যেন এ দ্বীপে থাকতে চায় না। ছোট ছোট পাতাহীন গাছ-ঝোপ-ঝাড়। হঠাৎ একটা কচ্ছপের দেখা মিলল। কচ্ছপ বলাটা অবশ্য ঠিক হবে না, কারণ এর খোলস বেশ নরম। কী করে আত্মরক্ষা করে সেটাই আশ্চর্য।

বিকেলের দিকে একটা উটশ্রেণির অদ্ভুত প্রাণীর মুখোমুখি হল ওরা। অনিলিখা দেখেই চিনেছে। ম্যাক্রোশেনিয়া। বহু হাজার বছর আগে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। উট, লামা, অ্যালপাকা প্রজাতির জীব। পা-গুলো আরেকটু লম্বা। দশফুটের মতো উচ্চতা। লম্বা গলা, ছোট মাথা। নাকের ফুটো চোখের ওপরে। পা-গুলো গণ্ডারের মতো পেশিবহুল। তবে এই প্রাণীটা উধাও হয়ে যাওয়ার প্রধান কারণ বুঝতে পারল অনিলিখা। প্রায় না দেখে ছুটে এসে ধাক্কাই মারছিল পলকে। ওটাকে ধরে পরীক্ষা করে দেখা গেল দু-ফুটের বেশি দূরত্বের

কোনও কিছুই স্পষ্ট দ্যাখে না প্রাণীটা।

যখনই কোনও প্রাণী দেখছে, রবার্ট আর পল দুজনে মিলে প্রচুর ছবি তুলেছে। মাপঝোপ করছে। হঠাৎ করে ওদের এত আগ্রহ কেন, কে জানে? ডেভিডকে খোঁজাটা যেন মূল উদ্দেশ্য নয়। ডেভিডের কথা তুলতেই পলের উত্তর,—আরেকটু এগিয়ে দেখা যাক না। ধৈর্য ধরো। ওর গায়ে তো আর চিপ বসানো নেই যে ট্র্যাক করে দেখতে পারব।

রবার্ট খুব কম কথা বলে। রাতে খেতে বসে হঠাৎ পলকে একটা বেমক্কা প্রশ্ন করে বসল,—ওই জাহাজের ম্যাপটাতেও যে এই একই দ্বীপের কথা বলেছে তা তুমি বুঝলে কী করে?

—সে ব্যাপারে আমাদের মাথা না ঘামালেও চলবে। যারা ওই সময়কার ম্যাপ সম্বন্ধে জানেন তাঁদের বেশ কয়েকজনের সঙ্গে আমি কথা বলে নিয়েছি। তারা নিশ্চিত এই দ্বীপই চিহ্নিত ছিল ম্যাপটাতে।

—কোন ম্যাপটার কথা বলছ পল? অনিলিখা অবাক হয়ে জিগ্যেস করে।

—ও তোমাকে বলা হয়নি। বারমুডা ট্রায়াংগেলে সাড়ে তিনহাজার বছর আগে একটা জাহাজডুবি হয়েছিল। তাতে একটা গিয়ার হুইল পাওয়া গিয়েছিল, যার ছবি 'হ্যাত্-শেপ্-সুৎ'-এর মমির ছবির সঙ্গে মেলে। তুমি তো এটা আগেই শুনেছ! ওই জাহাজেই আরেকটা ম্যাপ পাওয়া গিয়েছিল। ওই

গিয়ার হুইলের কাছেই। সেই ম্যাপ দেখে মনে হচ্ছে এই দ্বীপেরই উদ্দেশ্যে ওই জাহাজ রওনা হয়েছিল। সেরকমই ডাইরেকশন দেওয়া ছিল।

—তাহলে কি ওদেরও জানা ছিল এ অদ্ভুত দ্বীপের কথা? আশ্চর্য!

—হতেই পারে। 'হ্যাত্-শেপ্-সুৎ'-এর যখন বিজ্ঞানে এত আগ্রহ ছিল! পল বলে ওঠে।

—'হ্যাত্-শেপ্-সুৎ'-এর সময় ইজিপ্টের অনেক বাণিজ্য বিস্তার হয়েছিল। উনি নানান দেশে অভিযান করেন। যুদ্ধের জন্য নয়। মূলত বাণিজ্য বিস্তারের জন্য। হয়তো একই কারণে এই দ্বীপে আসতে চেয়েছিলেন। রবার্ট বলে উঠল।

—কিন্তু জাহাজ আর পৌঁছোয়নি। বারমুডা ট্রায়াংগেলেই সলিল সমাধি। গিয়ার হুইল থাকা সত্ত্বেও। পল বলে ওঠে।

—তার মানে অন্তত দু-দুবার অভিযান হয়েছে এই অভিশপ্ত দ্বীপে। একটু থেমে অনিলিখা ফের বলে,—পল, এখানে তো ফোনের কোনওরকম নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না। দরকার হলে কাউকে কিছু জানাব কী করে?

—আমার কাছে স্যাটেলাইট ফোন আছে। তা দিয়ে প্রয়োজনে জানানো যাবে। এসব ফোন স্যাটেলাইটের মাধ্যমে যোগাযোগ রাখে। ফোনের নেটওয়ার্কের দরকার হয় না। তবে ফেরা পর্যন্ত আমরা কেউ কোনওভাবে এ দ্বীপ

আবিষ্কারের কথা জানাব না। এ খবর যাবে আমার কাছ থেকে। এ দ্বীপের ওপর আমারই সবথেকে বেশি অধিকার। তাই আমি চাই না আগ বাড়িয়ে তোমরা কিছু জানাও। অবশ্য এ আবিষ্কারের সঙ্গে তোমাদেরও নাম যুক্ত থাকবে।

—পল, আমার নাম থাকল, কি না থাকল সেটা বড় কথা নয়। আমি তো এসেছি শুধু ডেভিডকে খুঁজতে। কিন্তু সেটাই তো খুব সিরিয়াসলি হচ্ছে বলে মনে হচ্ছে না। অনিলিখা বলে ওঠে।

পল চেঁচিয়ে ওঠে,—তা তুমি কী করতে বলছ? মাইক লাগিয়ে ওর নাম অ্যানাউন্স করব? ডেভিড! ডেভিড!

অনিলিখা চুপ করে রইল। যতই হোক পলের জন্যই তো এখানে আসা। সব খরচ তো ও-ই বহন করছে।

ওরা আজ রাতে খানিকটা খোলা জায়গা দেখে তাঁবু খাটাল। জায়গাটা পাথুরে। ছোট-বড় নানান চেহারার পাথরে জায়গাটা ভরে আছে। তবু তারই মধ্যে জায়গা করে তিনটে তাঁবু খাটানো হয়েছে। খানিকদূরে একটা ঝরনা আছে। সেখান থেকে খাবার জল আনা হয়েছে। এ দ্বীপের আরেকটা অবাক করার মতো ব্যাপার হল এখানকার গাছ। যে ক'টা গাছ পরিচিত বলে মনে হয়েছে তার মধ্যে পড়ে আপেল, চেরি, স্ট্রবেরি, আখরোট ও কাঠবাদামের গাছ। সবক'টাই শীতপ্রধান জায়গার গাছ। এখানকার গরমে কী করে হয় কে জানে?

অনিলিখা তাঁবুর মধ্যে শুয়ে ভাবতে থাকে। বাইরের জগতের সঙ্গে কোনও যোগাযোগ নেই। কোনওরকম যোগাযোগ করতে হলে পলকে জানাতে হবে। ওর স্যাটেলাইট ফোনই একমাত্র যোগাযোগের উপায়। পলের অনুরোধেই অনিলিখা ঠিক কোথায় আসছে তা বাড়িতেও জানায়নি। অর্থাৎ বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে অনিলিখার যোগাযোগের একমাত্র মাধ্যম হল পল। রবার্টকে ঠিক শিকারি বলে মনে হয় না। হয়তো শখের শিকার করে থাকতে পারে। কিন্তু শিকারির মতো হাবভাব, সজাগ দৃষ্টি নেই। মাঝে মাঝে ডায়েরি খুলে কি সব নোট করে।

বাইরে সামান্য বৃষ্টি শুরু হয়েছে। তাঁবুর ফাঁক থেকে অনিলিখা দূরের গাছগুলোর দিকে তাকিয়ে থাকে। আগামী দু-এক দিনেই পূর্ণিমা হবে। প্রায় বৃত্তাকার চাঁদের স্পর্শে এই পরিবেশ আরও মায়াবী হয়ে উঠেছে। কাঁপতে থাকা আঁধার রাতের গাছগুলো, পাতার ওপরে বৃষ্টির শব্দ, ঝোড়ো বাতাসের শন্‌শন্‌ শব্দ আর মাঝেমধ্যে অপার্থিব আওয়াজ— এই দ্বীপকে যেন আরও রহস্যময় করে তুলেছে। মনে হচ্ছে, চিরকালই এই দ্বীপ সারা পৃথিবীর কাছে অজানা থেকে যাবে। এখানকার জীবজগৎ থেকে শুরু করে সবকিছুই যেন অন্যরকম। তারা যেন আলাদাই থাকতে চায়। থাকতে চায় সব হিসেবের বাইরে।

28 মে, 2012

এরকম যে হবে তা স্বপ্নেও ভাবেনি অনিলিখা। ছ'টায় ব্রেকফাস্ট সেরে সাড়ে ছ'টায় ওদের বেরিয়ে পড়ার প্ল্যান ছিল। কিন্তু আজ সকালে রবার্টের দেখা নেই। পল তাঁবুতে খোঁজ করতে গেল। সেখানেও রবার্ট নেই। আশপাশের বেশ খানিকটা জায়গা তন্নতন্ন করে খুঁজে দেখা হল, কোথাও রবার্ট নেই। অথচ কিছু না বলে চলে যাওয়ার মতো দায়িত্বজ্ঞানহীন নয় ও। ওর সব জিনিসপত্র যেরকম ছিল সেরকমই আছে। শুধু ডায়েরিটা নেই।

সকাল দশটা অবধি খোঁজাখুঁজি করেও যখন রবার্টকে পাওয়া গেল না, তখন ওরা ঠিক করল যে পথ ধরে এগোচ্ছিল সে পথ ধরেই আরও এগিয়ে যাবে ওরা। যদি রবার্ট এগিয়ে গিয়ে থাকে।

বাঁ-হাতে সিগার, ডান হাতে একটা লাঠি নিয়ে পল আগে আগে যেতে থাকে।

ঘণ্টাখানেক বাদে হাঁটতে হাঁটতেই পল একটা কাগজ বের করে। তাতে চোখ বুলিয়ে বলে ওঠে—আমরা কাছাকাছি চলে এসেছি। এরপর ডারউইনের কথামতো একটা ছোট পাহাড় পাওয়ার কথা। পাহাড়টা পেরোলেই পাওয়া যাবে জায়গাটা।

—কোন জায়গা?

—একটা ছোট নদী পড়বে, তাতে নাকি সোনার নাগেট পাওয়া যায়।

—ও এটাই তা হলে তোমার আসল উদ্দেশ্য। সোনার সন্ধান! সেজন্যই অতরকম যন্ত্র নিয়ে ঘুরছ। হাতের লাঠিটা কি সোনার ডিটেকটার? মাটিতে তাই ঠুকে ঠুকে দেখছ! অনিলিখা থেমে বলে ওঠে—'ওহ্, তুমি সত্যিই ব্যবসায়ী!

পল খানিকক্ষণ চুপ করে রইল। কথাটার সরাসরি কোনও উত্তর না দিয়ে হাঁটতে হাঁটতেই বলে উঠল,—খেয়াল রেখো সামনে কোনও পাহাড় দেখতে পাও কি না। ডেভিড এ পথেই এসেছে। সোনার খোঁজে এগোলেই ডেভিডকে পাওয়া যাবে।

আরও মিনিট কুড়ি পরে একটা পাহাড় চোখে পড়ল। বেশ চড়াই। গাছ কম। পাথুরে পথ ধরে ওরা পাহাড়ের ওপর দিকে উঠতে লাগল। মাঝেমধ্যে বেশ বড় পাথর। তার ওপর পা ফেলে ব্যালান্স রেখে ওপরে ওঠা। ওপর থেকে কয়েকটা জলধারা নীচে নেমেছে। তাতে বেশ স্রোত।

প্রায় দেড়ঘণ্টা পাহাড়ে চড়ার পর ওরা অপেক্ষাকৃত একটা সমতল জায়গায় এসে পৌঁছোল। একটা পাথরের ওপর বসে বিশ্রাম নিচ্ছে এমন সময় হঠাৎ লক্ষ করল খানিকদূরে একটা

পুমা। ওদের দিকেই আসছে।

পল মুহূর্তের মধ্যে ওর বন্দুক বার করে তাক করেছে পুমাটার দিকে। পুমাটা কিন্তু কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে ওদের সামনে দিয়ে চলে গেল। খানিকদূরে একটা মরা হরিণ জাতীয় প্রাণী পড়েছিল। ওর নজর সেই দিকে। অনিলিখা বলে উঠল,—গুলি ছোড়ার দরকার নেই পল। এখানকার পুমা মৃত প্রাণীই খেয়ে থাকে। আমরা ওর প্রধান শিকার নই। চেহারা দেখেই বোঝা যায় জোরে ছুটতে পারে না।

পলকে আজ বেশ ক্লান্ত লাগছিল। অনিলিখা তাই বলে উঠল,—তোমাকে খুব ক্লান্ত দেখাচ্ছে। কাল রাতে ঠিকমতো ঘুমিয়েছিলে?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, আসলে রবার্টের জন্য চিন্তা হচ্ছে। কোথায় যে গেল! এখানে একটু বিশ্রাম নেওয়া যাক। বলে একটা পাথরের ওপর বসে আরেকটা সিগার ধরাল পল।

—পল, তুমি যে ডারউইনের লেখা নদীর কথা বললে, ওটার কথা তো ডায়েরির পাতায় কোথাও ছিল না!

পল মুচকি হেসে বলে উঠল,—লাস্ট কয়েকটা পাতা আমি আসলে গোপনীয়তার কারণে দেখাইনি। ওটাতে একটা নদীর কথা লেখা ছিল। সেখানে অনেক সোনার নাগেট ডারউইন খুঁজে পান।

—পল, তুমি যখন আমাকে এখানে আসতে বলেছিলে,

তখন আমার ওপরে এটুকু বিশ্বাস তোমার রাখা উচিত ছিল। না থাকলে আসতে বলাই উচিত হয়নি।

—বিশ্বাস করে ডেভিডকে বলেছিলাম বলেই তো আজকে এই অবস্থা। এই অংশে যদি কোনও সোনা পাওয়া যায় তো তার ওপর আমাদের বংশেরই পারিবারিক অধিকার। এ আবার বলার কী আছে? ডারউইন নিশ্চয়ই জানত যে তার সব সাফল্যের মূলে রিচার্ড আওয়েন। তাই রিচার্ডকে এই ডায়েরির পাতাগুলো আলাদা করে দিয়ে গিয়েছিল যাতে এই সোনার অধিকারী রিচার্ডই হয়। আর ডারউইন জানত রিচার্ড এ দ্বীপের কথা গোপন রাখবে। ডেভিড ওই সোনার খোঁজেই নির্ঘাত এখানে এসেছিল। বিশ্বাস ঘাতকতা করে।

—আর আমি যদি একটু অন্যরকম বলি। ডারউইন ডায়েরির পাতাগুলো রিচার্ড আওয়েনকে দেয়নি, দিয়েছিল জাহাজের ক্যাপ্টেন ফিৎজরয়কে। ফিৎজরয় তো সঙ্গেই ছিল। ডারউইন আর ফিৎজরয় ছিল অন্তরঙ্গ বন্ধু। তো কেন শুধু শুধু কয়েকটা পাতা ছিঁড়ে ডারউইন অতদূরে ইংল্যান্ডে রিচার্ডকে পাঠাতে যাবে? তার থেকে তো সহজ ছিল ফিৎজরয়কে দিয়ে রাখা। ফিৎজরয়ও এটা গোপনই রাখত।

—তুমি কি বলতে চাইছ অনিলিখা?

—তুমি নিশ্চয়ই বুঝতে পারছ আমি কি বলতে চাইছি।

আমি খোঁজ নিয়ে দেখেছি যে আমাদের ডেভিড ফিৎজ্রয়ের বংশধর। ও-ই এই ছেঁড়া পাতাগুলোর আসল মালিক। ও যখন এটা পায় প্রথমেই ওর তোমার কথা মনে হয়, কারণ তুমি সবথেকে বড় গোল্ড মাইনিং কোম্পানির মালিক। ডেভিডের আগ্রহ মূলত ছিল এখানকার ফ্লোরা আর ফনায়। এখানকার অদ্ভুত জীবজগতে। তবে পরে মূল্য বুঝতে পেরে সোনার মালিকানা ও অংশীদারিত্বও হয়তো দাবি করেছিল। তুমি ওকে আশ্বাস দিয়ে এখানে নিয়ে আসো। আর নিয়ে আসার পরই ওকে মেরে ফেলে একমাত্র দাবিদারকে সরিয়ে দাও। ভেবেছিলে ওর মৃত্যুর খবর কেউ পাবে না। ওর পেনটা তোমার কাছে দেখেই আমার প্রথম সন্দেহ হয়েছিল। তারপর যেভাবে তুমি দ্বীপের মধ্যে এগোচ্ছিলে, আমি নিশ্চিত হই যে এটাই তোমার প্রথমবার আসা নয়। এই দ্বীপে কোথায় কি—কোনদিকে যেতে হবে—তা নিয়ে তোমার মোটামুটি একটা ধারণা আছে।

মুহূর্তে পলের মুখ-চোখের চেহারা পালটে গেল। ক্রুর হাসি হেসে পল বলে উঠল,—এতটা যখন বুঝেইছ, তখন পুরোটাই শোনো। রবার্টও একই সন্দেহ করেছিল। তাই ওরও একই দশা হয়েছে। ওর ডেডবডিটা দিয়ে আশাকরি ইতিমধ্যে পুমাদের লাঞ্চ হয়ে গেছে। তোমারও একই দশা হোক, যাতে বাইরের কাউকে না বলতে পারো। মাইক ছাড়া আর কেউ

জানে না যে তোমরা আমার সঙ্গে এসেছ। আর জানা গেলেও এ দ্বীপের মাহাত্ম্য তো আছেই। সুইসাইড প্রমাণ করে দেব। আর মাইক! মাইক তো আমার পোষা গুন্ডা। অনেক মার্ডার ও নিজে হাতে করেছে। কিন্তু এক্ষেত্রে তুমি মাইকের হাতে মরবে না। মরবে আমার হাতে। গুডবাই অনিলিখা!

পল মুহূর্তের মধ্যে সিগারটা ফেলে ওর কোল্ট পাইথন .357 রিভলভার বার করে নেয়। অনিলিখার উদ্দেশ্যে গুলি ছুড়তে থাকে। একটা গুলি অনিলিখার ডানহাতে লাগে। সেই অবস্থাতেই অনিলিখা ছুটতে থাকে। নিশ্চিত মৃত্যু যদি এড়ানো যায়। হঠাৎ পিছনের ঝোপে আলোড়ন তুলে একটা প্রাণী বেরিয়ে আসে। বহু লক্ষ বছর আগে বিলুপ্ত এই বিশালাকার জীব পল আর অনিলিখার মাঝে। দু-পায়ের ওপর দাঁড়িয়ে কুড়ি ফুট উচ্চতার কিম্ভূতকিমাকার এই প্রাণীটা অনিলিখাকে আড়াল করে আছে। মেগাথেরিয়াম। বেশ কয়েকটা গুলির আওয়াজ আর এই অদ্ভুত প্রাণীটার আর্তচিৎকার পেছনে ফেলে অনিলিখা প্রাণপণে ছুটতে থাকে। ছোট-বড় নানান আকারের পাথরের ওপর দিয়ে ছোটা মুশকিল। হঠাৎ সামনের একটা পাথরে হোঁচট খেয়ে অনিলিখা পাহাড়ের ঢাল বেয়ে নীচের দিকে গড়াতে থাকে। মাথাটা প্রচণ্ড জোরে একটা বড় পাথরে এসে লাগে। পরমুহূর্তেই চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়।

29 মে, 2012

আস্তে আস্তে মুখটা স্পষ্ট হয়ে উঠল অনিলিখার কাছে। যে মুখটা ওর দিকে তাকিয়ে আছে তাকে দেখতে ঠিক সাধারণ মানুষের মতো নয়। রং ফরসার দিকে, পেশিবহুল সুদর্শন চেহারা, চওড়া কাঁধ, ছোট অথচ চওড়া মাথা, গোঁফ দাড়িওয়ালা মুখ। আরও দুটো মুখ দেখা গেল। একইরকম দেখতে। সবাই অনিলিখার দিকে তাকিয়ে আছে। ভাবলেশহীন চোখ। অনিলিখা নিজের দিকে লক্ষ করল। ডান হাতের গুলির জায়গাটায় নানারকম লতাপাতা শিকড় বাঁধা। মাথার পিছনেও অসহ্য যন্ত্রণা। মাথাতেও পাতালতার ব্যান্ডেজ। এরাই তাহলে অনিলিখাকে উদ্ধার করে নিয়ে এসেছে।

দূরে কাঠের আগুন জ্বালিয়ে গোল করে ঘিরে বসে আছে আরও জনা কুড়ি মেয়ে-পুরুষ। পরনে গাছের পাতা, বাকলের পোশাক। আর নানান শেপের ছোট ছোট সোনার টুকরো দিয়ে বানানো গয়না। সবাই অনিলিখার দিকে উৎসুক দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে। তাকানোরই কথা। এরকম পোশাক, এরকম দেখতে কোনও মানুষকে এরা দ্যাখেনি নিশ্চয়ই।

অত্যন্ত যন্ত্রণার মধ্যেও অনিলিখা বুঝতে পারল এরা কারা। ক্রোম্যাগনান মানবগোষ্ঠী, যারা আজ সারা পৃথিবী

থেকে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। একটা সময় হোমো স্যাপিয়েন্স, হোমো ইরেকটাস আর ক্রোম্যাগনান—এই তিন ধরনের মানব গোষ্ঠী ছিল। আজ শুধু রয়েছে হোমো স্যাপিয়েন্সরা। তা ক্রোম্যাগনানরা যে সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়ে যায়নি, তার প্রমাণ এরা। এদের বলা হত আদিম মানব গোষ্ঠীদের মধ্যে সবথেকে বুদ্ধিমান। এদের শিল্পকলা ফ্রান্সের গুহাতেও দেখতে পাওয়া যায়। তা, এরা এখানে এল কী করে?

খানিকবাদে আগুন ঘিরে এরা গোল করে হাঁটতে থাকে। মাঝেমধ্যে হাতদুটো আকাশের দিকে তুলে চিৎকার করে উঠছে। এ সবই কি অনিলিখার আরোগ্য কামনায়? না কি অন্য কিছু? কে জানে!

অনিলিখার মাথায় অনেকগুলো প্রশ্ন। পল এখন কী করছে? ও কি সোনার সন্ধান পেয়ে গেছে? ও নিশ্চয়ই অনিলিখাকে খুঁজে বের করে মারার চেষ্টা করবে। অনিলিখা মারা গেলে অনিলিখার সঙ্গে সঙ্গেই মুছে যাবে পলের সব কুকীর্তি। কিন্তু তার থেকেও বড় প্রশ্ন ও অনিলিখাকে এই অভিযানের সঙ্গী করল কেন? অনিলিখা তো আর সোনা খোঁজায় এক্সপার্ট নয়। নাহ্, আর ভাবা যাচ্ছে না, মাথা ঝিম্ঝিম্ করছে। অনেক রক্তপাত হয়েছে নিশ্চয়ই। আবার চোখ বুজল অনিলিখা।

8 জুন, 2012

অদ্ভুত এদের জীবন। কোনও জটিলতা নেই। কোনও চিন্তা নেই। শুধু একটাই প্রশ্ন, 'কাল কী খাব?' অন্য কোনও প্রশ্ন নেই বলেই লক্ষ বছরেও এদের কোনও পরিবর্তন হয়নি। জীবনটা একরঙা। এরা না করে চাষবাস, না পশুপালন। এদের না আছে কোনও বাসস্থান, না আছে পরিবার। এরা এমন কিছু করে না যার জন্য প্ল্যান করতে হয়। এমন কিছু ভাবে না যা কালকের চৌহদ্দির বাইরে। খিদে পেলে যা পায় তা-ই শিকার করে খেয়ে নেয়, যে ফল সামনে পায় তাই খেয়ে নেয়। সারা রাত খোলা আকাশের নীচে আগুন জ্বালিয়ে ঘুমোয়।

দিনের বেশিরভাগ সময়টা অলসভাবে গল্প করে কাটায়। শিকারের গল্প করে। কেউ হয়তো পুমা সেজে দেখায়, কীভাবে পুমা শিকার করেছিল। মেয়েরা দল বেঁধে নেচে নেচে গান গায়। বাকি সবাই অবাক দৃষ্টিতে দ্যাখে।

এদের ভাষা একেবারেই অন্যরকম। মুখের বিভিন্ন অংশে— দাঁতে, তালুতে জিভের স্পর্শে আওয়াজ করে একজন আরেকজনের সঙ্গে কথা বলে। এরা এতদিন ধরে বিচ্ছিন্ন বলেই হয়তো এদের ভাষা এতটা অন্যধরনের। প্রত্যেকের সম্পত্তি বলতে একটা রান্নার পাত্র, জল রাখার একটা কাঠের

পাত্র, পাথরের কুঠার আর তিরধনুক। ধনুকের ছিলাটা তৈরি করে পুমার লিগামেন্ট থেকে। তিরের মুখে লাগিয়ে নেয় জংলি ফুলের বিষ। কেউ শিকার করে আনার পরে তা দলের অন্যদের সঙ্গে ভাগ করে নেয়। এরা প্রত্যেকেই স্বাধীন। কেউ কারও ওপর নির্ভর করে না। এদের মধ্যে নেতা থাকে না। তবে এরা মোটামুটি কুড়ি-তিরিশ জনের দলে ঘোরে। নিজেদের মধ্যে ঝগড়া, মারপিট করে না।

অনিলিখার সবথেকে অবাক লেগেছে এদের নিজেদের মধ্যেকার সম্পর্ক। সবাই সবার জন্য ভাবে। যে দুর্বল, যার কোনও শিকার করার ক্ষমতা নেই, তারই সবার আগে শিকারের ভাগ জোটে। অথচ আত্মীয় পরিজনের মৃত্যুর মধ্যে অদ্ভুত নির্লিপ্ততা। যেন কিছুই হয়নি। আজই দুপুরে একজন মাঝবয়সি মহিলা মারা গেল। আগেই অসুস্থ ছিল হয়তো। লোকটা বোধহয় ওর স্বামী হবে। এতটুকু কাঁদল না। মাটি খুঁড়ে বডিটা ঢুকিয়ে দিয়ে কয়েকটা গাছের পাতা ছড়িয়ে দিল। তারপর অন্যদের সঙ্গে গল্প করতে লাগল। এরা কি মৃত্যুকে ভালোবাসে? কে জানে? তবে জীবনের ওপর এদের যে বিশেষ আগ্রহ নেই তা দেখেই বোঝা যায়। মাঝে মাঝে চুপ করে এক জায়গায় দল বেঁধে বসে থাকে ঘণ্টার পর ঘণ্টা। দেখে মনে হয় মৃত্যুই চায়, কিন্তু উপায়টা জানা নেই।

9 জুন, 2012

এত আনন্দ অনিলিখা আগে কোনওদিন পায়নি, যতটা পেল ডেভিডকে দেখতে পেয়ে। ডেভিড মারা যায়নি। এই দ্বীপের ওই আদিবাসীরাই ডেভিডকে উদ্ধার করে প্রায় আড়াই মাস আগে।

অনিলিখার থিয়োরিই ঠিক। ডেভিডের পূর্বপুরুষ ছিল ফিৎজ্‌রয়—ডারউইনের বিগ্‌ল জাহাজের ক্যাপ্টেন। ফিৎজরয়ের কাছে রাখা ডারউইনের লেখা ডায়েরির ছেঁড়া পাতা পেয়ে ডেভিডই যোগাযোগ করে পলের সঙ্গে। ভেবেছিল সোনার খোঁজ পেয়ে পলই ওই এক্সপিডিশানটা ফান্ড করবে। পল সঙ্গে সঙ্গে অভিযানে রাজিও হয়ে যায়। একজন ক্যামেরাম্যান, মাইক আর ডেভিডকে সঙ্গে নিয়ে চলে আসে এই আইল্যান্ডে। ডেভিডের সঙ্গে যে পল ছিল—এটা পলই জানাতে দেয়নি। ডেভিডের কাছ থেকে এখানকার ফ্লোরা-ফনা অর্থাৎ গাছ জীবজন্তু সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য নিয়ে নেয় পল। তারপর একদিন হঠাৎ ক্যামেরাম্যান মিকুচি হারিয়ে যায়। আর তার পরদিনই পাহাড়ে ওঠার সময় ডেভিডকে লক্ষ করে গুলি চালায় পল। তারপর পাহাড় থেকে নীচে ফেলে দেয় বডিটা।

ওকেও বাঁচায় এখানকার আদিবাসীরা। এই দ্বীপে অদ্ভুত কিছু জীবনদায়ী শিকড়-বাকড় আছে। তারই সাহায্যে

আদিবাসীরা নিশ্চিন্ত মৃত্যুর হাত থেকে ডেভিডকে রক্ষা করে। ওদেরই যত্ন-শুশ্রূষায় সুস্থ হয়ে ওঠে ডেভিড। কিন্তু এখনও ও যথেষ্ট দুর্বল। কীভাবে এ দ্বীপ থেকে বেরোনো যায় এসব নিয়ে যখন প্ল্যান করছে, তখনই ও অনিলিখার দেখা পায়।

সব শোনার পর অনিলিখা বলে,—পলের মতলব প্রথম দিকে আমি বুঝতে পারিনি। কলেজ লাইফেও তো অনেক কুকীর্তি করেছিল, যা আমি আর তুমি শুধু জানি। ভাবছিলাম হঠাৎ করে এতটা চেঞ্জ! রাতারাতি তোমাকে বাঁচাতে ওর এত আগ্রহ!

—মনে আছে, একবার টেস্ট ডেটাবেসে ঢুকে ও পরীক্ষার প্রশ্ন লিক করে দিয়েছিল। আরেকবার নিজে খারাপ পরীক্ষা দিয়েছিল বলে আমাদের সবার ডিজিটাল উত্তরপত্র কোরাপ্ট করে দিয়েছিল। সেবার শুধু ওর জন্যেই রিটেস্ট নিতে হয়েছিল। কীভাবে কাজটা করেছে সেটা কিন্তু আমি বুঝে গিয়েছিলাম। ডেভিড বলে ওঠে।

—ওকে তো সেবার তুমিই বাঁচিয়েছিল! সব জেনেও কিছু বলোনি। অনিলিখা বলতে থাকে, আমার এখনও মনে আছে আমেরিকার ডিফেন্সের অত্যন্ত সুরক্ষিত কম্পিউটার নেটওয়ার্কে একবার ও ঢুকে গিয়েছিল। তা নিয়ে কত কাণ্ড! পুলিশে পুলিশে ক্যাম্পাস ছয়লাপ হয়ে গিয়েছিল। কত তল্লাশি। কে করেছে, কী জন্য করেছে। সেবারও আমরা বলিনি বলে ও

বেঁচে গিয়েছিল।

একটু থেমে কী মনে হতে অনিলিখা ফের বলে ওঠে,— আচ্ছা, তুমি অ্যান্টিভাইরাস সফ্‌টওয়্যার লিখে খুব নাম করেছিলে না? এখনও করো?

—হ্যাঁ, ওটাই তো আমার মূল কাজ। আমি 'ডেটা-সিকিওর' বলে যে কোম্পানিটা তৈরি করেছি তারা অ্যান্টিভাইরাস সফ্‌টওয়্যারেই স্পেশালিস্ট। আমরা বিভিন্ন অ্যান্টিভাইরাস তৈরি করি, যাতে নেটওয়ার্ক ও ডেটা সুরক্ষিত রাখা যায়। আর তুমি? তুমিও তো অ্যান্টিসাইবার ফ্রড রিসার্চে খুব নাম করেছ! তুমিই তো সেই অটোসেপারেটর সফ্‌টওয়্যারটা তৈরি করেছ যা কম্পিউটারে ভাইরাস বা স্প্যাম দেখলেই তাকে নেটওয়ার্ক থেকে আলাদা করে দেবে, আর ডেটা সুরক্ষিত করবে। তুমি তো এবার ডেটা প্রটেকশান নিয়ে একটা স্পেশাল অ্যাওয়ার্ড পেলে, তাই না?

সম্মতি জানিয়ে অনিলিখা খানিকক্ষণ চুপ করে থাকে।

—কী ভাবছ?

—আচ্ছা রবার্টকে তুমি চেনো?—অনিলিখা বলে ওঠে।

—রবার্ট কে?

—আমাদের সঙ্গে এবারকার ট্রিপে রবার্ট ছিল। পল পরিচয় দিয়েছিল শিকারি হিসেবে। আমার কিন্তু কেন জানি না ওকে শিকারি বলে কখনওই মনে হয়নি। বরঞ্চ হাবেভাবে

বেশ শিক্ষার ছাপ। যথেষ্ট বুদ্ধিমান বলে মনে হত। বিজ্ঞানীসুলভ হাবভাব। জামার পকেটে ফাউন্টেন পেন আর নোটবুক নিয়ে ঘোরে এমন শিকারি আগে দেখিনি।

—কীরকম দেখতে?

—চোখে রিমলেস চশমা। পাকানো গোঁফ, কদমছাঁট চুল। উন্নত নাক। চওড়া ভুরু। ডান কানের পাশে লক্ষ করার মতো বড় কালো আঁচিল।

—আরে, উনি তো ফিল রবার্ট। ফিল আবার শিকারি হল কবে? ওটা তো ওর নেহাত শখ। আসলে ফিল হল ইউএসএ গভর্নমেন্টের সাইবার ক্রাইমের বিরুদ্ধে প্রধান অ্যাডভাইসার। নামকরা সায়েন্টিস্ট। যখনই কোনও সাইবার ফ্রড হয় সরকার সবার আগে ওরই দ্বারস্থ হয়। ওর মতো সাইবার ক্রাইম ধরার ব্যাপারে এক্সপার্ট আর নেই।

শুয়ে থাকলেও অনিলিখার চোখেমুখে উত্তেজনা ফুটে ওঠে।

—মাই গড! আমার অনুমানই তাহলে ঠিক। দ্যাখো, আমাদের তিনজনকেই ওর সঙ্গে না নিয়ে এলেও চলত। প্রশ্ন, আমাদের নিয়ে এল কেন? এটা কিন্তু হঠাৎ করে হয়নি। প্ল্যান করে আমাদের এই দ্বীপে নিয়ে আসে যাতে আমরা ওর কুকর্মে বাধা দিতে না পারি। আর ও আমাদের মারার সুযোগ পায়।

—কী কুকর্ম?

—ঠিক জানি না। তার আগে প্রশ্ন আমাদের তিনজনের মধ্যে কি কমন? মনে হয় বড় ধরনের কোনও সাইবার ফ্রড, করার প্ল্যান ওর ছিল। যাতে ও নিজে এক্সপার্ট। আমরা তিনজনেই ওই একই লাইনের। আমি, তুমি ও রবার্ট—আমরা তিনজনেই ছিলাম ওর এই কুকর্মের পথে প্রধান অন্তরায়। তাই ও আমাদের এই দ্বীপে নিয়ে এসে মেরে ফেলার চেষ্টা করে। এক যাত্রায় তিনটে ফল। সোনার খোঁজ, বিজ্ঞানীর সুনাম আর বড় ধরনের সাইবার ফ্রড করা।

—তা, সে তো এই দ্বীপে না এনেও মারতে পারত।

—আমাদের অন্য যেখানেই মারুক না কেন, তা নিয়ে তদন্ত হবেই। যদি প্রমাণ করে দেওয়া যায় যে এই দ্বীপে এসে সবাই আত্মহত্যা করতে চায় তাহলে সেটাই যথেষ্ট। আমরা নিজেরা আত্মহত্যা করেছি—ব্যস। এ ছাড়া এই ভূখণ্ডে এখনও কোনও দেশের অধিকার নেই। এ তো মানচিত্রের বাইরে থাকা এক আইল্যান্ড। এখানে কোনও দেশের আইনকানুনও খাটে না। তা ছাড়া এখানে আসাটা ওর বড় অ্যালিবাই। যদি আমেরিকায় সাইবার ক্রাইম ধরাও পড়ে ও বলবে তখন ও আমেরিকায় ছিল না। অন্য কোনও দেশের আইনকানুনও ওকে স্পর্শ করতে পারবে না।

—ঠিকই বলেছ। কি বদমাশ! আমাকেও যখন ও এখানে

নিয়ে এসেছিল, বলেছিল কোনওরকমভাবে যেন দেশের সঙ্গে যোগাযোগ না করি। গোপনীয়তার স্বার্থে। এখন মনে হচ্ছে ওর আসল উদ্দেশ্য ছিল অন্য। আমাদের তিনজনের ক্ষেত্রেই এটা কেউ জানতে পারত না যে আমরা এই আইল্যান্ডে এসেছি। আর ওর সঙ্গে এসেছি।

আজ অনিলিখা গত দু-দিনের তুলনায় অনেক সুস্থ বোধ করছে। এরা কী একটা পাতার রস খাওয়াচ্ছে, তাতে ক্ষতও যেমন তাড়াতাড়ি শুকোচ্ছে, একই সঙ্গে শক্তিও যেন তাড়াতাড়ি ফিরে পাচ্ছে। এখানে অনেকেই আত্মহত্যা করার চেষ্টা করে বলে এরা এসব ব্যাপারে অত্যন্ত অভিজ্ঞ। এখানে মরা অত সহজ নয়।

আজ উপজাতি সম্প্রদায়ের লোকজন সবাই কেমন যেন উত্তেজিত। অন্যদিন ওরা মাঝেমধ্যে অনিলিখার তদারক করতে আসে। আজ ওরা মাটিকে বারবার প্রণাম করছে। একটা গাছকে ঘিরে গোল করে ঘুরছে। মাঝেমধ্যে মাটিতে শুয়ে পড়ছে টানটান হয়ে। কী যেন কান পেতে শুনছে। তিরধনুক নিয়ে অন্যদিনের মতো শিকারের চেষ্টা করছে না। নিজেদের মধ্যে কথা বলছে না।

এই অস্বাভাবিক চাঞ্চল্যটা যে শুধু ওদের মধ্যে তা-ই নয়। কয়েকটা অ্যাগাউটি সমানে ছোটাছুটি করছে। এ ক'দিন বাঁদরগুলোকে দেখা যায়নি। আজ ওরা সমানে একগাছ থেকে

আরেক গাছে লাফিয়ে যাচ্ছে। ভয়ে ভয়ে তাকাচ্ছে। একটা শ্লথ সামনের গাছটাতে গত তিনদিন ধরে এক জায়গায় বসেছিল। আজ নেমে কোথায় চলে গেছে।

অনিলিখা যেটা ভাবছিল, ডেভিড সেটাই বলে উঠল,—কিছু একটা ঘটতে চলেছে এই দ্বীপে। জঙ্গলের সব জন্তুর মধ্যে ছটফটানিটা লক্ষ করেছ? ওরা আমাদের অনেক আগে অনুভব করতে পারে। এই আদিবাসীরাও টের পেয়েছে। মাটির পুজো করছে। কী হতে পারে?

—ভূমিকম্প! দেখেছিলাম এই দ্বীপটা ঠিক দুটো টেকটনিক প্লেটের সংযোগস্থলে রয়েছে। অর্থাৎ ভূমিকম্প হওয়ার প্রবণতা থাকা স্বাভাবিক।

—আজকে কত তারিখ?

—হিসেব তো সব গুলিয়ে গেছে। তবে মে-র শেষদিক বা জুনের শুরুর দিক বলে মনে হয়। কেন বলো তো?

—নাসা থেকে একটা বড় সৌরঝড় এক্সপেক্ট করছিল। এই সময়ই।

—ওহ্ মাই গড্! সব এখন মিলে যাচ্ছে। সৌরঝড় হলে বা সোলার ফ্লেয়ার হলে এ ধরনের আইল্যান্ডে ভূমিকম্পের চান্স অনেক বেড়ে যায়। ম্যাগনেটিজম ইনডিউস্ড আর্থকোয়েক। চৌম্বকতা থেকে ভূমিকম্প। একটু থেমে আবার অনিলিখা বলে ওঠে,—এবার বুঝতে পারছি কেন

এখানে বিবর্তন থেমে আছে। যে যার মতো আগের অবস্থায় আছে। সারভাইভাল অব দ্য ফিটেস্ট বা ন্যাচারাল সিলেকশন, কোনওটাই হয়নি।

—কেন? এ দ্বীপ ভূমিকম্প প্রবণ বলে?

—ঠিক তাই। আমরা না বুঝলেও কিন্তু জীবজগৎ ঠিক বুঝে যায়। নিশ্চয়ই আগেও এখানে বড়সড়ো ভূমিকম্প হয়েছে। আর তাই অন্য জায়গা থেকে প্রাণীরা এ দ্বীপে আসে না। বাঁচার জন্য কমপিটিশন না থাকায় এদের পরিবর্তনেরও দরকার হয় না। দুর্বলরা বেঁচে থাকে। ঠিক যেমন আফ্রিকায় রিসেন্টলি এক মানব প্রজাতি পাওয়া গেছে যাদের গত দশহাজার বছরেও স্বভাবে, হাবভাবে, চেহারায় কোনও পরিবর্তন আসেনি। এরা হল হাড্‌জা সম্প্রদায়। এরা আফ্রিকার তানজানিয়ার রিফ্‌ট ভ্যালির বাসিন্দা। আজও চাষবাস বা পশুপালন করতে জানে না। শিকার করে চালায়। সময় কীভাবে দেখতে হয় জানে না। 3-এর বেশি সংখ্যার ধারণা নেই। কারণ হিসেবে দেখা গেছে ওরা আফ্রিকার যে এলাকায় থাকে সে জায়গা অত্যন্ত অনূর্বর। চাষবাস হয় না। খাবার, জল পাওয়া যায় না। তাই অন্য কেউ ওই এলাকায় আসে না। এখানেও ঠিক একই ব্যাপার। এই আইল্যান্ডে কেউ আসে না। যারা আছে তারাও জানে যে-কোনও সময় এই দ্বীপ ভূমিকম্পে ধ্বংস হয়ে যেতে পারে। কি দরকার নিজেদের

পরিবর্তনের। পরিবর্তন ছাড়াই যদি দিব্যি চলে যায়। আর পরিবর্তিত হয়েও তো বাঁচা যাবে না ভূমিকম্পের দৌলতে। হয়তো যাদের ক্ষমতা ছিল, তারা বহু যুগ আগেই এই দ্বীপ ছেড়ে চলে গেছে। তাই এই দ্বীপে আমরা তেমন কোনও পাখি দেখিনি। যারা পড়ে আছে, তাদের মধ্যে হাজার হাজার বছর ধরে সুইসাইডাল টেন্ডেন্সি তৈরি হয়েছে। অন্য সব জায়গায় যারা বাতিল হয়ে গেছে, এখানে তারা বহাল তবিয়তে টিকে থাকতে পেরেছে কম্পিটিশন নেই বলে। ডারউইনও তাই এ দ্বীপ দেখে এ রহস্যের কোনও কিনারা করতে পারেননি। উনি বুঝতে পেরেছিলেন যে এ দ্বীপের কথা লিখলে উলটে লোকে ওনার থিয়োরি মানবে না।

—অসাধারণ রিজনিং অনিলিখা। কিন্তু তা হলে তো আমাদের এখনই এ দ্বীপ ছেড়ে বেরোনোর চেষ্টা করতে হবে। তুমি কি হাঁটতে পারবে?

মাথা নেড়ে সম্মতি জানায় অনিলিখা। কিন্তু তার আগেই পুরো আকাশটা যেন দুলে ওঠে চোখের সামনে। ডেভিড বসে পড়ে। আবার উঠে দাঁড়াতে গিয়ে পড়ে যায়। পুরো দ্বীপ যেন হঠাৎ জেগে উঠেছে। সবাই পাগলের মতো ছোটাছুটি করছে। একটা ছোট নীল হরিণ অনিলিখার পাশে কান উঁচু করে দাঁড়িয়েছে। কী করবে বুঝতে পারছে না। একটা টেপির একবার ওদিকে যাচ্ছে, একবার ফিরে আসছে।

হঠাৎ মাটিটা ফাটতে শুরু করল। বড় বড় ফাটল হঠাৎ করে ছড়িয়ে পড়ছে। আর ফালাফালা করে দিচ্ছে দ্বীপটাকে। ডেভিড আর অনিলিখা যেখানে দাঁড়িয়ে তার দশফুট সামনে একটা বড় ফাটল লম্বালম্বি উত্তর-দক্ষিণে চলে গেছে।

—ছুটে লাভ নেই ডেভিড! তুমি বেরিয়ে কোথায় যাবে? চারদিকে তো সমুদ্র। একটু ভাবতে দাও।

হঠাৎ একটা হেলিকপ্টারের আওয়াজ পাওয়া যায়। মাথার অনেক ওপরে একটা হলুদ রঙের হেলিকপ্টার। ডেভিড হাত নেড়ে পাগলের মতো লাফাতে থাকে। খোলা জায়গা, তাই ওদের চোখে পড়েছে। দ্রুত নেমে আসে হেলিকপ্টারটা। ইউ এস কোস্টাল গার্ডের লকহেড এইচসি 130। অনেক কষ্টে ল্যান্ড করে। কোনওরকমে অনিলিখাকে ধরে ডেভিড হেলিকপ্টারে গিয়ে ওঠে। পাইলটের পাশে বসে আছে জন। জন পেচি। অনিলিখাকে দেখে চিৎকার করে ওঠে—ঠিক আছে অনিলিখা? আর চিন্তার কিছু নেই।

6 জুলাই 2012

—তুমি কী করে জানলে জন যে আমরা বিপদে পড়েছি? অনিলিখা বলে ওঠে। ডেভিডের ফার্মহাউসে অনিলিখা, জন

আর ডেভিড মিলিত হয়েছে ঘটনার প্রায় একমাস পরে।

—দ্য গ্রেট গ্রেট গিয়ার হুইল। ধন্য ফ্যারাও হ্যাত-শেপ-সুৎ। সাড়ে তিন হাজার বছর আগে এরকম একটা যন্ত্র আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। ওটার মাধ্যমেই আমরা জানতে পারি যে এই দ্বীপে একটা মেজর আর্থকোয়েক হতে চলেছে। সোলার ফ্লেয়ার দশহাজার বছর পরে সর্বাধিক মাত্রায় পৌঁছোনোর জন্য। আর তুমিই তো বলেছিলে যে তোমরা ডেভিডকে খুঁজতে এরকম জায়গায় আসবে। তবে সমস্যা হচ্ছিল যে সোলার ফ্লেয়ারের জন্য প্লেনের জি পিএস সিস্টেম কাজ করছিল না। তাই দ্বীপটা খোঁজা সহজ হয়নি।

—তোমার মাথায় সাইবার ফ্রডের কথাটা কখন এল অনিলিখা? জন লেদার ইজিচেয়ারে হেলান দিয়ে বলে উঠল।

—এটা আমার কিছুতেই মাথায় ঢুকছিল না যে এত কাঠখড় পুড়িয়ে ও কেন আমাকে ইন্ডিয়া থেকে ওই দ্বীপে নিয়ে গেল। স্পেশালি ও জানে যখন ওই দ্বীপে কোনওরকম গণ্ডগোল করলে সেটা আমি ঠিক বুঝে যাব। আমাকে নিয়ে আসা মানে তো খাল কেটে কুমির নিয়ে আসা। আমি বা ডেভিড পলকে কাছ থেকে যেভাবে দেখেছি, ও কোনও সাইবার ফ্রড জাতীয় কাজ করলে সেটা সবার আগে আমরাই বুঝতে পারতাম। আর পৃথিবীর যে প্রান্তেই থাকি না কেন আমাদের জন্য ও ধরা পড়ত। এ ছাড়া রবার্টকে নিয়ে আমরা

তিনজনেই এই বিষয়ের নামকরা বিজ্ঞানী। রবার্টের পরিচয় জানার পরই মনে হল—পলের আসল উদ্দেশ্য কি অন্যকিছু? বিশাল মাপের কোনও সাইবার ফ্রড!

অবশ্য সোনার খোঁজ করাটা আর এ ধরনের দ্বীপ আবিষ্কার করে বিজ্ঞানী হিসেবে নামকরা—এগুলো ছিল ওর কাছে বোনাসের মতো। এমনিতেই ওর আক্ষেপ ছিল যে রিচার্ড আওয়েন তেমন স্বীকৃতি পায়নি।

—আর প্ল্যানটা কী সাংঘাতিক ছিল! ডেভিড বলে ওঠে,—অনিলিখা এটা না বললে কিছুতেই বোঝা যেত না। পল টিডি অ্যামেরিট্রেডের মতো শেয়ারব্রোকিং এজেন্টের ডেটাবেস হ্যাক করে। শেয়ার মার্কেটের ট্রেডারদের সোশ্যাল সিকিউরিটি নাম্বার, বাড়ির ঠিকানা, জন্মতারিখ ও অন্যান্য যাবতীয় তথ্য ও বের করে নিয়েছিল। পলের প্ল্যান ছিল একটা নির্দিষ্ট দিনে এসব তথ্যের সাহায্যে ও ওই শেয়ার হোল্ডারদের শেয়ার অ্যাকাউন্টগুলোর কন্ট্রোল নিয়ে নেবে। তারা কিছু বুঝতে পারার আগেই পল ইচ্ছেমতো ওদের হয়ে ট্রেড করে কিছু শেয়ারের দাম বাড়িয়ে বা কমিয়ে দেব। যে শেয়ারের দাম এভাবে বেড়ে যাবে তা ও নিজের অ্যাকাউন্ট থেকে বিক্রি করে লাভ করতে শুরু করবে। যে শেয়ারের দাম কমে যাবে তা পল কম দামে কিনে নেবে যাতে পরে তা বেশি লাভে বিক্রি করে দেওয়া যায়। মাত্র কয়েক ঘণ্টার

মধ্যে বহু বিলিয়ন ডলার লাভের প্ল্যান ছিল ওর। এ ছাড়াও পরে শুনেছি বিভিন্ন লোকের ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে ঢুকে সেখান থেকে টাকা ট্রান্সফার করার একটা প্ল্যানও ওর ছিল। সবই তুমি বানচাল করে দিয়েছ অনিলিখা।

অনিলিখা মুচকি হেসে বলে উঠল,—আসল কৃতিত্ব কিন্তু আমার নয়। আমরা ফিরে আসি 10 জুন সকালে। আমি এ ব্যাপারে ইউ এস সিকিউরিটিস অ্যান্ড এক্সচেঞ্জ কমিশনকে সচেতন করি। ওরা 11 জুন খোঁজ করে জানতে পারে যে টিডি অ্যামেরিট্রেডের মতো ব্রোকিং এজেন্টের ডেটাবেস হ্যাক করা হয়েছে। এই সংস্থা শেয়ার ইনভেস্টরদের ইনভেস্টমেন্ট সামলায়। প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নিতে নিতে ওদের 12 জুন হয়ে গিয়েছিল।

—তো? তাতে কী?

—পরে জানা গেছে, পলের আসল প্ল্যান ছিল 8 জুনই, এই কাণ্ড ঘটানোর। তা কিন্তু ও করতে পারেনি। আর সেটা আমার জন্য নয়। আমি তখন কিছুই জানাতে পারিনি। ওর হয়ে এ কাণ্ডটা যারা ঘটাত তারা সবাই ছিল আমেরিকায়। পলের কথামতো তারা পল বা মাইকের ফোনের অপেক্ষা করছিল। আর সেটাই হয়ে ওঠেনি। পল আর মাইক নিজেদের মধ্যেও যোগাযোগ করতে পারেনি।

—কেন? ওই আইল্যান্ড সুনামিতে ধ্বংস হয় তো 9 জুন!

অর্থাৎ 8 জুন তো পল ও মাইক বেঁচেই ছিল। তা জানাতে পারল না কেন?

—এখানে পলের মতো অতি চালাককেও প্রকৃতির হাতে চেকমেট হতে হল। পলের কাছে যোগাযোগের একটাই উপায় ছিল। সেটা হল স্যাটেলাইট ফোন। কিন্তু সোলার ফ্লেয়ার বেড়ে যাওয়ার জন্য স্যাটেলাইট ব্যবস্থা ভয়ানক ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। পলের আধুনিকতম প্রযুক্তির স্যাটেলাইট ফোনও তখন কাজ করেনি। ও এদেরকে নির্দেশ দিতে পারেনি। কারণ, ওটা স্যাটেলাইটের ওপর নির্ভরশীল।

—তাহলে? শেষে প্রকৃতির কাছেই হার মানতে হল পলকে।—জন বলে ওঠে।

—পল আর মাইকের কোনও খোঁজই পাওয়া যায়নি, তাই না?

—পুরো দ্বীপটারই হদিস পাওয়া গেল না, তো পল আর মাইক।

9.2 রিখটার স্কেলের ভূমিকম্প। সুনামি ঢেউ-এর উচ্চতাই ছিল আট-ন'তলা বাড়ির সমান। তাও এসেছে 500 কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা বেগে। পুরো দ্বীপটাই একঘণ্টার মধ্যে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। আমার মনে হয় 'হ্যাত্-শেপ্-সুৎ'-ও ওর যন্ত্রের মাধ্যমে এই বিপদের কথাই বুঝতে পেরেছিল এ দ্বীপের সম্বন্ধে। ও জানত যে যখনই সোলার ফ্লেয়ার বাড়বে এই

দ্বীপ ধ্বংস হয়ে যাবে। তাই ও এই দ্বীপে অভিযান করে। পলের মতো সোনার খোঁজে নয়। বিজ্ঞানের আগ্রহে।

ডেভিড চুপ করে বসে থাকে—আমাদের জন্য যারা এত কিছু করল, আমরা কিন্তু তাদের জন্য কিছুই করতে পারলাম না অনিলিখা। তাদের ফেলে পালিয়ে এলাম।

—কষ্ট পেও না ডেভিড, ওরা তো মৃত্যুই চেয়েছিল। এমনকী হয়তো শেষ মুহূর্তে পুজোও করছিল ভূমিকম্প চেয়ে, বাঁচার জন্য নয়। হাজার হাজার বছর ধরে মৃত্যুই ছিল ওদের নিয়তি, আর শেষে সে মৃত্যুই ওরা পেল। ডারউইনের কথাতেই বলি,—It is not the strongest of the species that survives, nor the most intelligent that survives, it is the one that is most adaptable to change, অর্থাৎ তারাই থাকে যারা পরিবর্তনের সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারে। ওরা তো সেটাই করেনি যুগ যুগ ধরে। তাই বাঁচার অধিকারও ওরা হারিয়েছিল বহু কাল আগেই।



রহস্য যখন সংখ্যায়

স্যাভান্ট কাদের বলে জানিস?

বিশ্বজিৎদা আমাদের সবাইকে চুপ করে থাকতে দেখে দ্বিগুণ উৎসাহে বলে উঠল,—কিছু লোক আছে যাদের হাবভাব অস্বাভাবিক মনে হবে, কিন্তু যদি খেয়াল করে দেখা যায় তা হলে দেখা যাবে তাদের অসাধারণ কিছু ক্ষমতা আছে। যেমন ধর, একটা টেলিফোন ডাইরেকটরি একবার পড়ে সে সবার নাম ও ফোন নাম্বার মনে রেখে দিতে পারে। কোন পাতায় কি আছে ছবির মতো মনে করে রাখতে পারে।

—তুমি তো 'রেনম্যান' সিনেমার লোকটার কথা বলছ, তাই না? প্রতীক বলে ওঠে।

—হ্যাঁ, 'রেনম্যান' যাকে ভিত্তি করে লেখা সে হল এরকম স্যাভান্ট। এদের অনেকের অসম্ভব স্মৃতিশক্তি। আবার কেউ কেউ মুখে মুখে জটিল গণনা মুহূর্তের মধ্যে করে ফেলে। একজন স্যাভান্ট তো দেখলাম ডেসিম্যালের পরে বাইশ হাজার পাঁচশো ডিজিট পর্যন্ত ভাগ করে বলে দিল।

—ডেসিম্যালের পরে বাইশ হাজার পাঁচশো ডিজিট! অসম্ভব!

—তার মানেই ভাব, আমাদের ব্রেন কত শক্তিশালী। ওরা

পারে মানে নিশ্চয়ই ব্রেনের ক্ষমতা আছে এসব ক্যালকুলেশন করতে পারার। ওরা ব্রেনকে ব্যবহার করতে পারে। আমরা পারি না। একটু থেমে পল্লবকে লক্ষ করে প্রশ্ন ছুড়ল বিশ্বজিৎদা, বলত ২/১৩ কত হয়?

মাথাটা খানিকটা চুলকে পল্লব বলে উঠল, 'কত বললে? ১৩/২।'

'খুব বুঝেছি। তোকে উলটে বুঝিয়ে রাখলেও উত্তরটা বেরোবে না। কিন্তু ওরা বলে যেত ০.১৫৩৮৪...দশমিকের পরে যত ইচ্ছে ডিজিট ওরা ইচ্ছেমতো বলে যেতে পারে। এসব স্যাভান্টদের অনেকেরই অটিজম থাকে। কেন না—

বিশ্বজিৎদাকে থেমে যেতে হল, কারণ দরজাটা খুলে গেছে। অনিলিখা ঘরে ঢুকেছে। শনিবারে শনিবারে মিলনদের বাড়িতে আমরা সব জড়ো হই। তার মধ্যে অনিলিখাই অনিয়মিত। কিন্তু ওর আসা মানেই আমাদের কাছে সারা বিশ্বের দরজা খুলে যাওয়া। পৃথিবীর কোথায় কী হচ্ছে সব খবর অনিলিখার ঠোঁটস্থ। বিশ্বজিৎদা যে থেমে গেল তা স্বাভাবিক। অনিলিখার সামনে ও আজকাল মুখ খুলতে বিশেষ সাহস পায় না।

চেয়ারটা টেনে বসতে বসতে অনিলিখা বলে উঠল,— এ জন্যই তো স্যাভান্টদের নিয়ে এখন এত রিসার্চ হচ্ছে। ওদের ব্রেন কীভাবে কাজ করে তা জানা গেলেই ব্রেনের

অনেকটা রহস্যের সমাধান হয়ে যাবে। আমার এক বন্ধু আছে। নাম লুকা ম্যাত্তাজ্জি। ইতালিয়ান। বিখ্যাত নিউরো সার্জেন। ও এসব নিয়ে অনেক রিসার্চ করছে।

—তা তোমার ব্রেন নিয়েও একটু রিসার্চ করতে বলো। ঠোঁটের কোণে একটা বাঁকা হাসি নিয়ে বিশ্বজিৎদা বলে উঠল।

কোনও ভ্রূক্ষেপ না করে অনিলিখা বলতে থাকে,—লুকার সঙ্গে অনেকদিন বাদে এবার দেখা হবে।

—কলকাতায় আসছে বুঝি?

—নাহ্, আমি ইতালি যাচ্ছি।

—কবে?

—নেক্সট উইকে।

—তা এতদিন বলোনি যে! আমি, বুবলু দুজনেই একসঙ্গে বলে উঠি।

—ইতালিতে যাব বলে সেই তিনমাস আগে সেনজেন ভিসার জন্য অ্যাপ্লাই করেছি। পরশু খবর এসেছে অ্যাপ্রুভড। তা ভিসা না পাওয়া পর্যন্ত যাওয়ার কথা কী করে বলি?

—তা শুধু ইতালি? না পুরো ইউরোপ?

—না, পুরো ইউরোপ ঘুরতে আরও সময় লাগবে। অতদিন সময় পাব না। ইতালিতে অনেক দেখার জিনিস আছে। আমার এবারকার সঙ্গী আশিস সমাদ্দার।

—আশিসবাবু! বিশ্বজিৎদা হেসে উঠল। সঙ্গে আমরাও।

আশিসবাবু অনিলিখার পাশের বাড়িতে থাকেন। বয়স পঁয়ষট্টির মতো। রোগা ছিপছিপে চেহারা। সবকিছুতেই সবজান্তা ভাব। ধারণা, পৃথিবীর কোনও কিছুই ঠিক হচ্ছে না। সবেতেই সন্দেহ। আর যে কাজের যে নিয়ম, পারলেই সেই নিয়ম ভেঙে ফেলেন। পাড়ার মাঠে আমরা যখন ক্রিকেট খেলি, মাঝেমধ্যে পাশে দাঁড়িয়ে দেখেন আর নানান ধরনের মন্তব্য করেন। যেমন সেদিন, আমাদের ভোম্বল দিব্যি ভালো ব্যাট করে। তা একটা বল মিস করতে না করতেই পাশ থেকে আশিসবাবুর মন্তব্য ভেসে এল, 'ছ্যা, ছ্যা—এটা একটা ব্যাটিং হল? ঠিক এই মিসটেকটা গাভাসকার করত। আজীবন আর শিখে উঠতে পারল না। ব্যাটটা এই এইভাবে'—বলে ওনার হাতে ধরা ছাতা আর বাঁ পা-টাকে সামনে একটু এগিয়ে নিয়ে দেখিয়ে দিলেন। ওনার ধারণা ওনার থেকে ভালো কেউ কোনও ব্যাপারেই নেই।

—তা, ভালো সঙ্গী পেয়েছ তা হলে। ইন্ডিয়ান মাফিয়া মিট্‌স ইতালিয়ান মাফিয়া। বিশ্বজিৎদা হাসি থামিয়ে বলে ওঠে।

—হ্যাঁ, জীবনে বাংলার বাইরে যাননি। আমি যাচ্ছি শুনে লাফিয়ে উঠলেন। একেবারে নাছোড়বান্দা। আমার সঙ্গে যাবেন। ওনার খরচ অবশ্য উনি নিজেই দেবেন।

—তা লুকা কোথায় থাকে?

—ও থাকে পোর্টোফেনি বলে একটা জায়গায়। কাছাকাছি বড় শহর জেনুয়া। পোর্টোফেনি শুনেছি খুব বড়লোকদের জায়গা। ইতালিয়ান রিভিয়েরার মধ্যে পড়ে। লুকা আমাকে মাসতিনেক আগে একটা ই-মেল করেছিল। তাতে লিখেছিল ও নাকি দুরন্ত একটা কিছু আবিষ্কার করতে চলেছে। আমি তার উত্তরে পরপর দুটো ই-মেল পাঠালাম, কী আবিষ্কার? উত্তর এল না, হয়তো গোপনীয়তার স্বার্থে ও রিপ্লাই করতে চায় না। তাই আর মেল করিনি।

—তুমি তো বললে যে উনি নিউরোসার্জেন। তা হলে ব্রেন কীভাবে কাজ করে তা নিয়েই কিছু একটা হবে নির্ঘাত। তন্ময় ওর পাণ্ডিত্য ফলায়।

—তা, সে যাই হোক। এর মাসখানেক পরে একটা মেল পেলাম। এবার ও লিখেছে একেবারে অন্য ব্যাপারে। ও নাকি কোনও কিছুতে ফোকাস করতে পারছে না। হয়তো একটা কিছু ভাবছে, পরক্ষণেই ভাবনাটা যেন অন্যদিকে ঘুরে যাচ্ছে। আর সেটার ওপরে ওর যেন কোনও নিয়ন্ত্রণই নেই।

—হঠাৎ করে একজন নিউরোসার্জেন তার নিজের ব্যাপারে তোমাকে লিখবে কেন?

—আমারও সেটাই প্রশ্ন ছিল। তবু আমি ওকে কিছু যোগাভ্যাস, প্রাণায়াম ইত্যাদি করতে বললাম। ওগুলো করার

পরে কীরকম থাকে তা জানার জন্য আরেকটা মেল করেছিলাম। তার কোনও উত্তর আসেনি। এবার যখন দেখা হবে তখন এ বিষয়ে কথা বলব।

—তা তুমি যে আশিসবাবুকে নিয়ে যাচ্ছ, উনি তো সবার সঙ্গে ঝগড়া বাধিয়ে বসবেন।

—হ্যাঁ, সেটাই তো চিন্তা, এই তো ভিসা আনতে গিয়ে উনি সেদিন কনসুলেটের লোকটাকে গাধা বললেন।

—সে কী! তা ওরা কিছু বলেনি?

—ভাগ্যিস বাংলায় বলেছিলেন! ওরা শুনেছে 'টাটা'। মিষ্টি হেসে তাই 'চাও' বলেছে। 'চাও' মানে ইতালিয়ানে 'হ্যালো'। তবে কাউকে বিদায় জানানোর জন্যও 'চাও' কথাটা ব্যবহার করা হয়।

—তা ওনার কী বক্তব্য ছিল?

—ওনার বক্তব্য ওনার মতো লোকেদের এমনিতেই সবদেশের ভিসা দেওয়া উচিত। তাতে সেই দেশেরই গৌরব বাড়বে।

সেদিন আরও খানিকক্ষণ আড্ডা হল। তবে ঘুরে ফিরে বারবার ইতালির কথাই উঠে আসছিল। কখনও গ্যালিলিও, কখনও লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি, কখনও মার্কোপোলো-কলম্বাস-মাইকেলেঞ্জেলো। এটা ঘটনা যে সেই রোমান পিরিয়ড থেকে আরম্ভ করে মধ্যযুগ—ইতালির প্রভাব পড়েছে সারা বিশ্বে।

দুই

—আপনি যে রাস্তা দিয়ে হাঁটছেন, তার নাম জানেন?

আশিসবাবু মাথা নেড়ে 'না' বলাতে অনিলিখা বলে ওঠে,—ভিয়া ডে ফেরি ইমপেরিয়ালি। রোমের প্রধান রাস্তা। মুসোলিনি তৈরি করেছিলেন। তবে তৈরি করতে গিয়ে ভেঙে ফেলেছিলেন রোমের অনেক পুরোনো বিল্ডিং-প্রাসাদ। কলোসিয়াম, রোমান ফোরাম, পিয়াজ্যা ভেনেজিয়া—সবই এই রাস্তার ধারে।

—শহর তো নয় মিউজিয়াম। আকাশের তলায় বড় একটা মিউজিয়াম। সবই যেন মধ্যযুগের। আশিসবাবু বলে ওঠেন।

—ঠিকই বলেছেন। ইউনেস্কোর ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট সব থেকে বেশি আছে ইতালিতে। তার মধ্যে সব থেকে বেশি আছে রোমে।

ওরা ফুটপাথ ধরে কলোসিয়ামের দিকে হাঁটতে থাকে। রোমে ওরা পৌঁছেছে গতকাল। ফ্রাঙ্কফোর্ট থেকে এয়ার ইতালিয়ার ফ্লাইটে রোমের লিওনার্দো দ্য ভিঞ্চি এয়ারপোর্ট। বিখ্যাত ইঞ্জিনিয়ার-আর্কিটেক্ট লিওনার্দোর নামে এই এয়ারপোর্ট। সেখান থেকে ট্যাক্সিতে হোটেল। হোটেলটা থ্রিস্টার। রোমের প্রধান স্টেশন রোমা টার্মিনির কাছেই। পাশাপাশি দুটো সিঙ্গল রুম বুক করা ছিল। রাতটা কাটিয়ে

ভোর হতেই বেরিয়ে পড়েছে অনিলিখারা।

প্রথমেই ওরা দুদিনের জন্য হপ্-অন, হপ-অফ বাসের টিকিট কেটে ফেলেছে। খোলা ছাদের দোতলা বাস। শহরের চওড়া রাস্তা ধরে প্রধান প্রধান ট্যুরিস্ট স্পটগুলো সব ঘুরে দেখায়। যতক্ষণ টিকিট ভ্যালিড থাকে, যতবার ইচ্ছে ওঠা-নামা যায়।

রোম মানে শুধু চওড়া রাস্তা অবশ্য নয়। মাঝেমধ্যেই সরু রাস্তা, গলি। মধ্যযুগের পাথর বসানো রাস্তা। বিশাল বিশাল প্রাসাদের পাশে ছোট ছোট চার্চ। বহু পুরোনো বাড়ি। অনিলিখা মুগ্ধ হয়ে দেখছে, আর বাসের গাইডের কথা শুনে মাঝে মাঝে নোট করছে। আশিসবাবু অবশ্য তেমন ইমপ্রেস্‌ড নন। 'রোমান হলিডে' নামে একটা সিনেমা কোনওকালে দেখেছিলেন। ওই রাস্তা-ফোয়ারা এসব শুধু খুঁজে যাচ্ছেন। একবার বললেন,—কলকাতার ধর্মতলা পাড়াও এর থেকে ভালো। এখানে আরও বেশি পুরোনো বাড়ি এই যা।

টিবের নদীর অন্য পাড়ে ভ্যাটিকান সিটি। সম্পূর্ণ আলাদা রাষ্ট্র। পোপের অধীনে। একটা সময় পুরো রোমই ছিল পোপের অধীনে। পরে শুধু ভ্যাটিকান সিটিকে, পোপের হাতে দেওয়া হয়। বাস থেকে নেমে বিশাল লাইন পেরিয়ে সেন্ট পিটার্স ক্যাথিড্রাল দেখেছে ওরা। এত বিশাল চার্চ যে হতে পারে, তা কল্পনা করা যায় না। খ্রিস্টানদের সব থেকে বড়

চার্চ। ভেতরে প্রচুর বহুমূল্য ছবি ও মূর্তি। মাইকেলেঞ্জেলো, বার্নিনি, এবং আরও অনেক বিখ্যাত আর্কিটেক্ট-আর্টিস্টদের ছবি ভাস্কর্যে সাজানো এই ক্যাথিড্রাল। এসব দেখেও আশিসবাবু সাত-আটবার হাই তুলেছেন।

এরপর সিস্টার্ন চ্যাপেল দেখে অনিলিখারা চলে এসেছে পিয়াজ্জা ভেনেজিয়ায়। বাস থেকে নেমেই চোখে পড়ে বিশাল সাদা প্রাসাদ। ইতালির প্রথম রাজা ভিক্টর ইমানুয়েল-2-এর স্মৃতিতে মনুমেন্ট। কাছেই প্যালাজো ভেনেজিয়া। একটা সময় পোপ এখানেই থাকতেন।

এসব দেখে ওরা সেখান থেকে চলেছে কলোসিয়ামের পথে। মেন রাস্তা থেকে আরেকটা রাস্তা ডানদিকে সামান্য উঁচুর দিকে উঠে গেছে। সেই রাস্তা ধরে হাঁটতে হাঁটতে অনিলিখা বলতে থাকে—আশিসবাবু, রোমকে বলা হয় 'সিটি অফ সেভেন হিলস'। সাতটা ছোট ছোট পাহাড় আছে এখানে। তার মধ্যে এটা একটা। প্যালাটাইন হিলস। রোমের বেশ কিছু অভিজাত পরিবার এখানে থাকত। চলুন ওদের বাড়িগুলো দেখে আসি।

প্যালাটাইন হিলসে উঠতে উঠতে অনিলিখা বলতে থাকে,—রোমান সভ্যতার সময়ে পৃথিবীর প্রতি চারজনের মধ্যে একজন রোমের অধীনে ছিল। ভাবতে পারেন এসব অভিজাত পরিবারের কীরকম ক্ষমতা ছিল?

এখন অবশ্য ওসব প্রাসাদ মানে কিছু পাথরের স্তূপ। কিছু পিলার। ভাঙা ছাদের কিছু অংশ পড়ে আছে। তবু সেই পাথরের নিশ্বাস প্রশ্বাসে যেন রোমান সভ্যতার হারিয়ে যাওয়া দম্ভ।

প্যালাটাইন হিল্‌স থেকে নেমে ওরা কলোসিয়ামের দিকে হাঁটতে থাকে। অনিলিখা আশিসবাবুকে দূরের কলোসিয়ামের দেওয়াল দেখিয়ে বলতে থাকে,—এর অন্য নাম ফ্ল্যাভিয়ান অ্যাম্ফিথিয়েটার। অষ্টম শতাব্দিতে তৈরি। পঞ্চাশ হাজার লোকে এই অ্যাম্ফিথিয়েটারে বসে জন্তুর সঙ্গে গ্ল্যাডিয়েটারের আমৃত্যু সংগ্রাম দেখত। কখনও এখানে সাজানো যুদ্ধ হত তো কখনও অপরাধীদের শাস্তি দেওয়া হত।

কলোসিয়ামের সামনে কয়েকজন গ্ল্যাডিয়েটারের পোশাকে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আশিসবাবু তাদের দেখে বলে বসলেন,—এখনও গ্ল্যাডিয়েটারদের মারপিট হয় না কি এখানে?

অনিলিখা মজা করে বলে ওঠে,—হ্যাঁ, ওদের সঙ্গে ছবি তুলে টাকা না দিলে মারপিট করে বই কি। এদের সঙ্গে একদম ছবি তুলবেন না। এদের খুব দুর্নাম।

সামনের গেটটা বন্ধ দেখে অনিলিখা বলে ওঠে—আপনি এখানে একটু ওয়েট করুন। আমি খোঁজ নিয়ে আসি এর টিকিট কোথায় পাওয়া যায়, আর ঢোকার গেট কোথায়।

বলে ও কলোসিয়ামের পাশ দিয়ে অন্য গেটের দিকে হাঁটতে শুরু করে।

মিনিট পনেরো বাদে অনিলিখা ফিরে আসে।

—নাহ্, বিশাল লাইন। লাইনেই একঘণ্টা দাঁড়িয়ে থাকতে হবে। আগেই অনলাইনে টিকিট কাটা উচিত ছিল। ওই লাইনে এখন দাঁড়ালে কলোসিয়াম ছাড়া রোমের আর কিছুই দেখা যাবে না। বাইরে থেকেই দেখে নেওয়া যাক।

কলোসিয়ামের বাইরের দেওয়ালটা প্রায় দশ-বারোতলা বাড়ির সমান উঁচু। নানান জায়গায় দেওয়াল ভেঙে গেছে। আর তার ফাঁক দিয়ে ভেতরের খানিকটা অংশ দেখা যাচ্ছে। আশিসবাবু এসব দেখতে দেখতে হঠাৎ পকেট থেকে একটা জিনিস বার করে বলে ওঠেন,—এই দ্যাখো, কলোসিয়ামের মিনিয়েচার, তুমি যাওয়ার পর একটা লোক এসে আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করল। ইংরেজিতে। মিলান থেকে এখানে বেড়াতে এসেছে। ইন্ডিয়া থেকে এসেছি শুনে এটা গিফ্ট করল।

—আর আপনিও অম্লান বদনে নিয়ে নিলেন! রোমের লোকেদের খুব একটা সুনাম নেই। এর পর থেকে সাবধান হবেন। দেখি! বলে অনিলিখা জার্মান সিলভারের কলোসিয়ামের প্রতিমূর্তিটা হাতে নিয়ে নেড়েচেড়ে দেখতে থাকে।

—আশ্চর্য এরকম মিনিয়েচার তো এখানকার কোনও

দোকানে দেখলাম না। এটা আমি আমার কাছে রাখলাম। হোটেলে ফিরে আপনাকে দিয়ে দেব। লোকটাকে দেখতে কীরকম ছিল? অনিলিখা জিগ্যেস করে।

—দেখে তো বেশ শিক্ষিত মনে হল। চোখে রিমলেস চশমা। কাঁচাপাকা দাড়ি। টাকমাথা, ডান চোখের পাশে আঁচিল। বুক পকেটে পেন।

—ঠিক আছে, ওই লোকটাকে দেখতে পেলে আমাকে জানাবেন।

কলোসিয়ামের পথে হাঁটতে হাঁটতে ওরা এগিয়ে চলে সার্কাস ম্যাক্সিমাসের দিকে। রোমান সভ্যতার সব থেকে বড় স্টেডিয়াম। এখানে ঘোড়ায় টানা রথের রেস হত।

অনিলিখা বলে,—বুঝলেন, আমাদের সল্টলেক স্টেডিয়ামের থেকেও বড় ছিল। দেড়লক্ষ লোক বসতে পারত। ঘোড়ার টানা রথের দৌড় তখনকার দিনে খুব ডেঞ্জারাস স্পোর্টস ছিল। প্রায়শই ধাক্কা লাগত আর প্রতিযোগীরা মারা যেত।

রাস্তা থেকে খানিকটা নীচে এই জায়গাটা। এখনও অনেকে আশেপাশের ঢালু জায়গাতে বসে আছে। নীচে কিছু ছেলে ফুটবল খেলছে।

সার্কাস ম্যাক্সিমাসের পাশে একটা বেঞ্চিতে বসে অনিলিখা কলোসিয়ামের মিনিয়েচারটা নেড়েচেড়ে দেখতে

থাকে। নীচের দিকে একটা ছোট বর্গাকার জায়গা। ব্যাটারি লাগানোর জায়গা যেরকম হয়। ওটা খুলতেই একটা ছোট কাগজ বেরিয়ে আসে। তাতে ইংরেজিতে লেখা, 'তোমাদের ওপর লক্ষ রাখা হচ্ছে। পরে হোটেলে ফিরে দেখো, এটার মধ্যে অন্য খোপে একটা চিপ রাখা আছে। ওটা যত্ন করে রেখে দিও। পরে কাজে লাগবে। এ কাগজটা পড়ার পর নষ্ট করে দিও।'

তিন

পরদিন অনিলিখারা বেরোল প্যান্থেয়ন দেখতে। রোমান সভ্যতার সময়ে তৈরি মন্দির। এত পুরোনো মন্দির সারা বিশ্বে হাতে গোনা।

ন'টার মধ্যে বেরোনোর ইচ্ছে ছিল। বেরোতে বেরোতে এগারোটা হয়ে গেল। রাতে আশিসবাবুর ঘুম হয়নি। চিঠির দৌলতে। ওনার ধারণা কিছু মাফিয়া ওনার পিছু নিয়েছে। রাজারহাটে যে নতুন জমিটা কিনেছেন তার খবর এখানেও এসে গেছে।

হোটেলে ফিরে কালকের চিঠিটাকে পুড়িয়ে ছাইটাকেও ফেলে দেওয়া হয়েছে। কিন্তু রহস্য হল লোকটা কে? হঠাৎ

করে চিঠিটা দিতে গেল কেন? মাইক্রোচিপটাও অনিলিখা খুঁজে পেয়েছে। ছোট 2 মিলিমিটার বাই 2 মিলিমিটার সাইজ। ওটাকে যত্ন করে রেখে দিয়েছে অনিলিখা। মাইক্রোচিপটা কী উদ্দেশ্যে দেওয়া হয়েছে কে জানে! কী আছে ওতে? নানান প্রশ্ন। তবে বেড়ানোর মজাটা নষ্ট করার কোনও উদ্দেশ্যই নেই অনিলিখার, তাই ওসব ভুলে বেরিয়ে পড়েছে।

প্যান্থেয়ন খুঁজে বের করতে বেশ খানিকটা সময় লেগে গেল। একে তো সরু সরু রাস্তা দিয়ে যেতে হয় তারপর রোমানরা খুব একটা হেল্পফুল নয়, নিজেদের রোমান সম্রাট অগাস্টাস আর জুলিয়াস সিজারের বংশধর ভাবে। ভালোভাবে ডিরেকশন দেওয়া নেই। আসলে এত বেশি ট্যুরিস্ট দেখে ওরাও বিরক্ত।

তবে প্যান্থেয়ন খুঁজে পাওয়ার পর মনে হল পরিশ্রম সার্থক। এত বড় সাপোর্টহীন কংক্রিটের ডোম এত বছর পরেও কোথাও তৈরি হয়নি। অথচ কী নিখুঁত শিল্পশৈলি। প্যান্থেয়নের ওপরের দিকে ডোমের মধ্যিখানে গোল করে সামান্য খোলা। ভিতরে তাই বাইরের আলো এসে পড়েছে।

প্যান্থেয়ন থেকে বেরিয়ে সরু গলির মধ্যে একটা ক্যাফেতে গিয়ে বসল অনিলিখা। পাথরের রাস্তা। দুপাশের বাড়িগুলো অন্তত কয়েকশো বছরের পুরোনো। পাথরের দেওয়াল।

কয়েকটা পায়রা হেঁটে বেড়াচ্ছে। রাস্তার বেশ খানিকটা অংশ দু-পাশের বাড়িগুলোর ছায়া কেড়ে নিয়েছে। রৌদ্রোজ্জ্বল আকাশ থাকা সত্ত্বেও ঠান্ডা লাগছে। হাজার বছরের পুরোনো এসব রাস্তা দেখলেই কেমন যেন রোমাঞ্চ হয়। এ রাস্তায় বন্দি হয়ে আছে হাজার বছরের সভ্যতার ইতিহাস। রাস্তার পাথরগুলো যেন তারই সাক্ষী।

—গেল্যাটো খাবেন?

—সে আবার কী?

—রোমের সম্রাটরা খেত। ঠান্ডা করা এক ধরনের ডেজার্ট। ইতালিতে আসবেন আর গেল্যাটো খাবেন না, তাই হয় না কি?

—তা হলে তো গেল্যাটো খেতেই হয়। আমার জন্য একটা বড় গেল্যাটো।

—গেল্যাটোর এখনকার নাম কিন্তু আইসক্রিম।

—ও হরি! তা হলে গেল্যাটো অন্যসময় খাব। এখন ক্যাপুচিনো খাওয়া যাক।

—জানেন তো ক্যাপুচিনো এরা শুধু ব্রেকফাস্টের সময়ে খায়। অন্য সময়ে খাওয়ার কথা ভাবতেই পারে না। অন্যান্য সময়ে এরা কফির অন্য প্রিপারেশনগুলো খায়। এক্সপ্রেসো, ক্যাফে ম্যাকিয়াতো, ক্যাফে লাটে—নানান ধরনের কফি। দুধের মাত্রা অনুযায়ী নানান নাম।

বলতে বলতে অনিলিখা থেমে গেল। রাস্তার ওপরেই অন্য একটা টেবিলে ছাতার তলায় যে লোকটা বসে আছে তাকে ডিসকভারি চ্যানেলে অনিলিখা দেখেছে। লোক না বলে ছেলে বলাই ভালো। বয়স কুড়ির কাছাকাছি হবে। কী যেন বলেছিল চ্যানেলটাতে! অনিলিখা মনে করার চেষ্টা করে। ছেলেটা ছোটবেলায় অঙ্কে ফেল করত। একা একা থাকত। এমনকী কথাও উলটো বলত। 'আমি আম খাব'-র বদলে 'খাব আম আমি'—এ ধরনের।

ষোলোর কাছাকাছি বয়সে ও এক অস্বাভাবিক ক্ষমতার অধিকারী হয়। বিশাল বিশাল গুণ, ভাগ ও মুখে মুখে করে ফেলতে শুরু করে। কম্পিউটারের থেকেও তাড়াতাড়ি জটিল গণনা করতে পারে।

ছেলেটার নাম মনে পড়ছে না। এইটুকু মনে পড়ছে জার্মান। সঙ্গে যে লোকটা তাকে দেখে ইতালিয়ান মনে হয়। স্যুট-টাই পরা। সাদা চুল। টিকোলো নাক। দুজনকে দেখে মনে হচ্ছে কোনও সিরিয়াস আলোচনা হচ্ছে। জার্মান ছেলেটা টেবিলের ওপর ঝুঁকে পড়ে অনুচ্চস্বরে কীসব বলছে। ডান কপালে সামান্য কাটা দাগ।

আশিসবাবু অনিলিখার দৃষ্টি অনুসরণ করে বললেন,—কি, তোমার চেনা?

—না, ঠিক চেনা নয়। ওই যে সবুজ জামা পরা

ছেলেটা—ওর কিছু অস্বাভাবিক ক্ষমতা আছে। সেই সূত্রে টিভিতে দেখাচ্ছিল। ছেলেটার অসাধারণ গণনা শক্তি। 23 to the power 62 কত বলতে পারেন? এই ছেলেটা কিন্তু এরকম যে-কোনও কিছু মুহূর্তের মধ্যে ক্যালকুলেট করে ফেলে।

—হ্যাঁ, অনেকের ওরকম ক্ষমতা থাকে। এ আর বলার মতো কী? আমারই তো একটা অদ্ভুত ক্ষমতা আছে, একবার যার কথা শুনি, তাকে মনে রেখে দিই। এই তো ব্যাঙ্কে জাস্ট গলা শুনে সেদিন মেয়েটার নাম বলে দিলাম। ক'দিন আগে আমাকে একবার ফোন করেছিল—মনে রেখে দিয়েছি। তা বলে কি নিজের নামে ঢ্যাঁড়া পেটাতে যাব! চলো পিৎজা খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরোনো যাক। রোমে আজকে তো লাস্ট দিন, দেখি কতটা কভার করা যায়। স্প্যানিশ স্টেপ, ট্রেভি ফাউন্টেন, ফাউন্টেন অফ ফোর রিভার্স—অনেক কিছু বাকি। তা ছাড়া এখানকার মেট্রোতেও তো একবার চড়তে হবে। আমার বড় শ্যালক শুধু প্যারিসের মেট্রোর কথা শোনায়। আমিও এবার রোমের মেট্রোর কথা শোনাব।

পিৎজার অর্ডার দিয়ে অনিলিখা আরেকবার ওই টেবিলটার দিকে তাকাল। দুজনের মাঝে টেবিলের নীচে একটা ব্রিফকেস। স্থান-কাল-পাত্র বিচারে ব্রিফকেসটা কেমন যেন বেমানান।

চার

রোম থেকে ভেনিস ছুটে চলেছে ট্রেন। ইন্টারসিটি ট্রেন। তাই স্টপেজ কম। মধ্য ইতালির রোম থেকে উত্তর-পূর্ব ইতালির ভেনিস। অনেকটা পথ। ছ'ঘণ্টার যাত্রা। কেবিনের মধ্যে অনিলিখা, আশিষবাবু ছাড়া আরেকজন মহিলা আছেন। দেখে ইতালিয়ান মনে হয়।

আশিসবাবু মাঝেমধ্যেই অধৈর্য হয়ে বাইরের প্যাসেজে হাঁটতে যাচ্ছেন। এবার একটা খবরের কাগজ হাতে নিয়ে ফিরলেন।

—কী—কিনলেন?

—আরে না, আমি ওভাবে পয়সা খরচ করি না। একজন এটা সিটে রেখে বাথরুমে গেল। আমি তুলে নিলাম।

—আপনি তো বিপদে ফেলবেন দেখছি। দিন, আমি ফেরত দিয়ে আসি। কাগজটা হাতে নিয়ে উঠতে গিয়ে একটু চমকে ওঠে অনিলিখা। কালকের সেই স্যুট-টাই পরা ভদ্রলোকের ছবি। কাগজের নীচের দিকে বেশ খানিকটা জায়গা নিয়ে খবরটা। কিন্তু ইতালিয়ান ভাষায়, তাই কেবিনের অন্য যাত্রীর শরণাপন্ন হতে হল।

মহিলা ভাঙা ভাঙা ইতালিয়ান উচ্চারণে ইংরেজিতে বললেন,—ইনি হলেন ফ্রান্সেসকো। এখানকার নামকরা

নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট। ওনাকে কাল বিকেল পাঁচটা নাগাদ মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে।

—কোথায়?

—হোটেল মার্কোপোলোর লবিতে। ওটা স্প্যানিশ স্টেপসের কাছেই একটা নামকরা হোটেল। রাস্তা ভিয়া কনডোট্যির ওপরে।

—তা হলে তো অনেকেরই লক্ষ করা উচিত। ওটাই তো রোমের ফ্যাশন স্ট্রিট।

—আসলে ভিয়া কনভোট্যি হচ্ছে উইন্ডোশপিং—এর জায়গা। প্রচুর ট্যুরিস্ট। তাই কেউ কাউকে লক্ষ করে না। রিপোর্টে লিখেছে যে হোটেলে স্টাফেরা নাকি ছিল। ওদের ওপর নজর ছিল না। ঢুকতে দেখেছিল। একটা বড় ট্যুরিস্ট গ্রুপ ওই সময়ে আসায় ওরা ব্যস্ত ছিল। তবে ওরা চেক-ইন করেনি। লবিতে বসে খানিকক্ষণ ফোনে ব্যস্ত ছিল। খানিকবাদে ওরা খেয়াল করে যে একজন লবির সোফায় বসে ঘুমোচ্ছে। ডেকে কথা বলতে গিয়ে দেখে মৃত। অন্য জনের কোনও পাত্তা নেই। এত বড় একজন সায়েন্টিস্ট-এর মৃত্যু। পুলিশ তাই নড়েচড়ে বসেছে।

আশিসবাবু ফিসফিস করে বলে ওঠেন,—তোমার দেখা ওই লোকটা সঙ্গে ছিল না তো? পুলিশে জানাবে?

—হওয়া সম্ভব। তবে রোমের পুলিশের খুব একটা সুনাম

নেই। ওদের জানানোর আগে একবার লুকার সঙ্গে কথা বলে নেওয়া দরকার।

ওই ভদ্রমহিলা আশিসবাবু ও অনিলিখাকে কথা বলতে দেখে কিছু একটা আন্দাজ করে বলে ওঠে,—আপনারা কিছু জানেন এবিষয়ে?

আশিসবাবু সেটা শুনে দ্বিধাহীন কণ্ঠে বলে উঠলেন,—উই নো নাথিং। এমনকী এই ভদ্রলোককে আমরা কোনওদিন দেখিনি। আর নিউক্লিয়ার রিসার্চেও আমাদের কোনও আগ্রহ নেই।

এতটা না বললেও হত। অনিলিখা সামলানোর চেষ্টা করে, কি কারণে এনাকে মারা হতে পারে কিছু লিখেছে?

—শোনা যাচ্ছে ওনার কাছে এখানকার নিউক্লিয়ার রিসার্চের, ইউরোপের নিউক্লিয়ার ফেসিলিটির সম্বন্ধে অনেক দরকারি তথ্য ছিল। সেরকম কিছু টপ সিক্রেট ইনফরমেশন হাতিয়ে নেওয়ার জন্যই খুন করা হয়েছে সন্দেহ করা হচ্ছে। কিছু টেররিস্ট গ্রুপ এর পিছনে থাকতে পারে বলে মনে করছে পুলিশ।

আরও কিছু কথার পরে অনিলিখা কাচের দরজা ঠেলে কেবিনের বাইরে চলে এল। লম্বা প্যাসেজ। প্যাসেজে প্রত্যেকটা কেবিনের সামনে একটা করে সিট বসার জন্য। ও সেরকমই একটা ফাঁকা সিটে বসে লুকাকে ফোন করে।

খানিকবাদে ফোনের অন্যপ্রান্তে লুকার গলা পাওয়া যায়,—পরন্তো।

—আমি অনিলিখা বলছি।

এবার পরিষ্কার ইংরেজিতে লুকা বলে ওঠে,—আরে অনিলিখা! তোমার কথাই ভাবছিলাম, তুমি ইতালিতে এসে গেছ, অথচ ফোন করোনি। তাই চিন্তা করছিলাম। তা পোর্টোফিনো আসছ কবে?

—ওই তো, যেমন জানিয়েছিলাম দুদিন বাদে। 22শে এপ্রিল। আমি তার আগে তোমাকে ফোন করে নেব। এখন অন্য কারণে ফোন করছি। তুমি নিউক্লিয়ার সায়েন্টিস্ট ড. ফ্রান্সেসকোর মৃত্যুর খবরটা পড়েছ?

—হ্যাঁ, খবরের কাগজে দেখলাম। তুমি কি ওনাকে চিনতে? খুব পণ্ডিত লোক ছিলেন। ভেরি আনফরচুনেট। ওনার মতো লোকের যে কেউ শত্রু হতে পারে, ভাবা যায় না।

—না, অমি চিনতাম না, তবে কাল একটা ক্যাফেতে আমার থেকে একটু দূরে অন্য একটা টেবিলে বসেছিলেন। ওনার সঙ্গে যে বসেছিল, তাকে আমি চিনি। কয়েকমাস আগে ডিসকভারি চ্যানেলে দেখিয়েছিল। একধরনের ম্যাথমেটিক্যাল জিনিয়াস। নামটা মনে নেই। আমার মনে হয় ফ্রান্সেসকোর মৃত্যুতে ওই লোকটার হাত আছে। আমি ওদের একসঙ্গে

দেখেছি দুটো নাগাদ। আর ছ'টা নাগাদ ফ্রান্সেসকোকে মৃত অবস্থায় পাওয়া গেছে। হয়তো...

অনিলিখাকে থামিয়ে লুকা শান্ত গলায় বলে ওঠে,—তুমি কি ওই লোকটাকে আইডেনটিফাই করতে পারবে?

—ডেফিনিটলি। লোকটার নাম মনে পড়ছে না। জার্মান। আমি শিওর যে আমার ডেসক্রিপশান শুনে পুলিশ ওকে খুব সহজেই শনাক্ত করতে পারবে। তাই ভাবছিলাম এখানকার পুলিশ—পোলিজিয়া বা ক্যারাবিনিয়েরিতে যোগাযোগ করব কি না।

—খবরদার না। এসব ব্যাপারে একেবারে ইনভলভড হোয়ো না। তুমি কি মনে করো এরকম হাইপ্রোফাইল মার্ডারে পুলিশের যোগসাজশ থাকবে না। ওরা তোমাকে ফাঁসিয়ে প্রথমেই জেলে পুরে দেবে।

—তা তুমি কোনও হেল্প করতে পারবে না? তোমার তো অনেক জানাশোনা।

—হ্যাঁ, আমি দেখছি, কী করতে পারি। তবে তুমি আর এটা নিয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা কোরো না, ভেনিস ঘুরে এখানে এসো, তারপর যা কিছু একটা করা যাবে।

—আমি ভেনিস যাচ্ছি তুমি জানলে কী করে? তুমি মন পড়তে পারো না কি?

—রোম দেখে ফেলেছ, ব্যাকগ্রাউন্ডে ট্রেনের আওয়াজ

পাচ্ছি। ভেনিস-ও যে তোমার ইটিরিনারিতে আছে তা আর বলতে হবে? একে একে দুই করে ফেললাম।

আরও খানিকক্ষণ কথার পর ফোন কেটে দিল অনিলিখা। লুকার কথাই ঠিক। পুলিশে যোগযোগ করাটা এ মুহূর্তে একটু রিস্কি। কলোসিয়ামের মিনিয়েচারটার কথা লুকাকে বলা হয়নি। আবার ফোন করতে গিয়ে থেমে গেল অনিলিখা। আশিসবাবুর হাবভাব দেখে কেউ মজা করেনি তো? লুকাকে সাক্ষাতেই বলা ভালো।

পাঁচ

—আরে, এ তো বৃষ্টির জলে ডুবে যাওয়া কলকাতা। আমাদের ঠনঠনিয়ার কথা মনে হচ্ছে। স্যান্টা লুসিয়া স্টেশন থেকে বেরিয়েই আশিসবাবু বলে উঠলেন।

আশিসবাবুর ভেনিসের ডেসক্রিপশন অনিলিখার মনোমতো না হলেও স্বীকার করতেই হবে যে দুটোর মধ্যে অনেক মিল আছে।

ভেনিসের রেলস্টেশন স্যান্টালুসিয়া থেকে বেরিয়েই থমকে দাঁড়াতে হয়। সামনে শুধু জল আর জল। স্টেশনের সামনে থেকেই বাস ছাড়ছে। বাস মানে অবশ্য বড় স্টিমার। বলা

হয় ভেপরেট। গ্র্যান্ড ক্যানেল ধরে ভেপরেট যাচ্ছে ভেনিসের নানান প্রান্তে। ভেনিস হল অ্যাড্রিয়াটিক সমুদ্রের ধারে এরকম ছোট ছোট অনেকগুলো দ্বীপের সমষ্টি। একশো সতেরোটা এরকম দ্বীপ আছে। আর চারশো ন'টা ব্রিজের মাধ্যমে এরা একটা আরেকটার সঙ্গে যুক্ত। এগুলোর মধ্যে মধ্যে দিয়ে বয়ে যাচ্ছে সরু সরু খাল।

ভেপরেটের খোলা জায়গায় সামনের দিকে দুটো চেয়ারে গিয়ে বসল অনিলিখা আর আশিসবাবু।

খালের জলের রং অদ্ভুত রকমের সবুজ। আর তা দিয়ে ভেপরেটের পাশ দিয়ে চলেছে সরু সরু কালো রঙের দাঁড়বাওয়া বোট। যারা দাঁড় বাইছে তাদের গায়ে সাদা জামা, কালো প্যান্ট, মাথায় টুপি।

—এগুলো হল ভেনিসের বিখ্যাত গন্ডোলা। চড়বেন না কি?

—ওরে বাবা, উলটোলে তো সলিল সমাধি। এখানে ডুবলে গঙ্গাপ্রাপ্তিও হবে না। আমি ওসবে নেই। আর লোকে এত ভেনিস ভেনিস করে—বাড়িগুলোর কী অবস্থা দেখেছ? পলেস্তারা খসে দেওয়ালের ইট বেরিয়ে গেছে। এবার ফিরে গিয়ে আমার বাড়িটারও একটা ভেনিসোচিত নাম দেব। 'স্যান্টা অ্যাশিসা।'

—হ্যাঁ, লেগুন এলাকা তো। সমুদ্রের নোনা জলই তো

বইছে এসব খালে। বাড়িগুলো তাই তাড়াতাড়ি খারাপ হয়ে যায়। তাও এসব বাড়ির অনেক দাম। ভেনিস অনেকটাই মানুষের হাতে তৈরি। কয়েক শতক ধরে খাল থেকে মাটি তুলে দ্বীপগুলোকে এরা আরও উঁচু করেছে। বাড়িগুলোর ভিত শক্ত করতে গাছের গুঁড়ি ব্যবহার করেছে। তাও ভেনিস আস্তে আস্তে জলে ডুবে যাচ্ছে।

—পরশু অব্দি না ডুবলেই হল। তা, বোটে করেই শুধু ঘুরতে হবে না কি?

—না, হেঁটেও ঘোরা যায়। হোটেলে জিনিসপত্র রেখে আমরা হেঁটে হেঁটেও ঘুরতে পারি। সব দ্বীপগুলোর মধ্যে ব্রিজ আছে। ছোট ছোট ব্রিজ। ওই দেখুন—।

বলতে গিয়ে থেমে গেল অনিলিখা। গ্র্যান্ড ক্যানেল থেকে ডানদিকে একটা সরু খাল বেরিয়ে গেছে। বড়জোর বারো-তেরো ফুট চওড়া। তারই ওপর দিয়ে একদিক থেকে আরেকদিক যাওয়ার ছোট ব্রিজ। ব্রিজের একদিকে একটা বাড়ি। অন্যদিকে খানিকটা খোলা একটা জায়গা,—ভেনিসে যাকে বলে ক্যাম্পি। সেই ক্যাম্পিতে একটা গোল টেবিলে বসে আছে সেই জার্মান ছেলেটা। অন্যদিকের ভদ্রলোককে এক ঝলক দেখা গেল। চেনা মুখ নয়। ইতিমধ্যে ভেপরেট ওই জায়গাটা ছেড়ে এগিয়ে গেছে—তাই ভালো করে দেখা গেল না। ভেপরেটের স্পিড কমছে। সামনেই কোনও জেটি

আছে। অনিলিখাদের হোটেল স্যান্টা ফরমোসা আরও বেশ কয়েকটা স্টপ পরে।

—আশিসবাবু, আপনি জিনিসপত্র নিয়ে সেন্ট মার্কোস স্কোয়ারে নেমে হোটেলে চলে যান। আমি একটু জেটিতে নেমে ঘুরে আসছি।

আশিসবাবু কিছু বলার আগেই অনিলিখা বোটের ভিড় ঠেলে রিয়াল্টো জেটিতে নেমে গেল।

মিনিট কুড়ি বাদে আশিসবাবু সেন্ট মার্কোস স্কোয়ারে এসে নামলেন। অনিলিখার হঠাৎ করে নেমে যাওয়া ওনার একদম পছন্দ হয়নি। বলা নেই, কওয়া নেই,—এখন এত লাগেজ নিয়ে একা নামা!

ভেপরেটে একটা ভাসমান জেটিতে ধাক্কা মেরে থামল। দড়ি ফেলে বোটটাকে আরও কাছে টেনে আনা হল। তার পরও নামার সময়ে আশিসবাবু যেভাবে লাগেজ নিয়ে সবার প্রথম লাফ দিলেন তা দেখার মতো। নেমে সোজা হোটেলের দিকে হাঁটতে লাগলেন। বাঁদিকে প্যালাজো ডুকালে ফেলে গ্র্যান্ড ক্যানেলের পাশ দিয়ে দুমিনিটের হাঁটা। ডানদিকে সারি সারি গন্ডোলা দাঁড়িয়ে আছে। বাঁ-দিকে প্যালাজো ডুকালের পরপর আর্চগুলো। তাতে নানান ধরনের শিল্প কারুকার্য। একে ডজের প্রাসাদও বলে। ডজ ভেনিসের ইলেকটেড গভর্নমেন্টের হেড। ডজ অ্যানজেলো এখানে

নাইনথ সেঞ্চুরিতে সরকারের মূল দপ্তর করেছিলেন। এখানেই ডজ থাকতেন। তারপর অবশ্য অনেকবার সংস্কার হয়েছে। তা হলেও এর পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় দাঁড়িয়ে পড়তে হয়।

এটাই ভেনিসের কেন্দ্র। একজন গাইড বড় একটা চাইনিজ গ্রুপকে চিনাভাষায় রাস্তার স্থান মাহাত্ম্য বোঝাচ্ছে। পায়রাগুলো নির্ভীকভাবে ঘুরে বেড়াচ্ছে। দোকানগুলোতে ভেনিসের নামাঙ্কিত নানান জিনিস বিক্রি হচ্ছে। আশেপাশে বেশ কয়েকজন ভিখিরি বসে আছে। এখানে ভিখিরিদের ভিক্ষা চাওয়ার স্টাইলটা বেশ ক্ল্যাসিকাল। উবু হয়ে বসে মাথা নীচু করে সামনে একটা বাটি ধরে থাকে। এদেরকে এড়িয়ে আশিসবাবু তাড়াতাড়ি এগোতে লাগলেন। হঠাৎ একজন ছাতা বিক্রেতা আশিসবাবুর দিকে এগিয়ে এল। 'এক ইউরো' —বড় সাদা রঙের ছাতা। কাউকে গিফটের জন্য খুব ভালো। আশিসবাবু ছাতাটা কিনে লাগেজগুলো নিয়ে এগোতে লাগলেন।

হোটেলটা একেবারে গ্র্যান্ড ক্যানেলের ধারে, খুব সুন্দর। পুরোনো বিল্ডিং সংস্কার করে তৈরি। খড়খড়ির জানলা। খুললেই রাস্তা আর তারপর গ্র্যান্ড ক্যানেল। এখানে ক্যানেল এতটাই চওড়া যে অন্যপ্রান্তের প্রাসাদগুলোকে খালি চোখে প্রায় দেখাই যায় না।

অনিলিখা ফিরল প্রায় দু-ঘণ্টা পরে। কাকভেজা। এর মাঝে বেশ একপশলা বৃষ্টি হয়ে গেছে।

—নাহ্, লোকটাকে দেখতে পেলাম না। যাওয়ার আগেই উধাও হয়ে গেছে। তবে সঙ্গের লোকটার পরিচয় পেয়েছি। ক্যাফের লোকটা চেনে। ইউনাইটেড নেশনস-এর ফুড ডিপার্টমেন্টের হেড কোয়ার্টার রোমে। ওই সংস্থারই হেড। আমি যাওয়ার দু-তিন মিনিট আগেই ওনারা উঠে গেছেন। চারদিকে খোঁজ করলাম। কিন্তু পেলাম না।

আশিসবাবুর ঘরের চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে অনিলিখা বলে, —ছাতাটা কোথায় কিনলেন?

—এই আসার পথে। ওনলি ওয়ান ইউরো।

অনিলিখা ছাতাটা হাতে নিয়ে সুইচ টিপে খুলল। বড় সাদা দামি প্লাস্টিকের ছাতা। ট্রান্সপারেন্ট। ভেতর থেকে বাইরেটা দেখা যায়।

—এক ইউরো? এর দাম দশ ইউরোর কম কিছুতেই হতে পারে না। যে দিয়েছিল—তাকে খেয়াল আছে?

—আরে সব কিছুতে তোমার ডিটেকটিভগিরি। এক ইউরো মানে পঁয়ষট্টি টাকা। কম হল? আমার আর কাজ নেই ছাতাওয়ালার চেহারা মনে রাখব। তবে লোকটার চোখে কালো গগল্‌স ছিল। ফরসা রং। অন্তত এটুকু বলতে পারি যে এই লোকটা আর কলোসিয়ামের

সামনে লোকটা এক নয়।

ততক্ষণে অনিলিখা ছাতাটা ভালো করে দেখতে শুরু করেছে, ছাতার হ্যান্ডেলে ম্যানুফ্যাকচারিং লেবেলটা দেখে অনিলিখা বলে ওঠে,—মেড ইন ইতালি। কিন্তু আমার মনে হচ্ছে খুব ছোট করে তার নীচে কিছু লেখা আছে। ম্যাগনিফাইং গ্লাসের তলায় ফেলতে হবে। খানিকক্ষণের জন্য আমার ঘরে নিয়ে যাচ্ছি।

—তা যাও, কিন্তু ছাতাটাকে অক্ষত রেখো।

অনিলিখা নিজের ঘরে ঢুকে দরজা লক করে দিল। ক্যানেলের দিকে একটা ছোট ব্যালকনি আছে। ব্যালকনিতে যাওয়ার দরজাটা বন্ধ করে পরদা টেনে দিল। তারপর বিছানায় মাথার কাছে রাখা আলোটা জ্বেলে ম্যাগনিফাইং গ্লাস দিয়ে দেখতে লাগল। লেখা আছে 'স্যান্টা ক্রোসে, 24/1'—কোম্পানির ফ্যাক্টরির ঠিকানা? কেউ কি কিছু জানাতে চাইছে? তা না হলে এত ছোট করে লেখা কেন? আর সেরকম হলে কোম্পানির নামটাও থাকত। পিনকোড থাকত, আর শেষের 1-এরই বা অর্থ কী? এটা নয়তো যে কেউ কাল ওই ঠিকানায় দুপুর একটায় যেতে বলেছে। তারপর মনে হল 24 মানে চব্বিশ ঘণ্টার হিসেবে নয় তো! সেক্ষেত্রে হয় রাত একটা। একবার চান্স নেবে ওই অ্যাড্রেসে গিয়ে? তা হলে আর ঠিক তিন ঘণ্টা বাকি।

ছয়

ভেনিসের গন্ডোলায় চড়া সত্যি অন্যরকম অভিজ্ঞতা। ছোট ছোট খাল বা রি ধরে অনিলিখার গন্ডোলা এগিয়ে চলেছে। এই খালগুলো বড়জোর বারোফুট চওড়া। দু-ধারে ইট বেরিয়ে থাকা বাড়ি। দেখে মনে হয় জলে ডুবে আছে। অনেক বাড়ির চৌকাঠ থেকে সিঁড়ি নেমে এসেছে জলে। আর সেখানে তাদের ব্যক্তিগত নৌকো রাখা আছে। গন্ডোলায় ভেলভেটের সিট। পায়ের নীচে দামি কার্পেট। এত রাতে কোথাও যেতে গেলে গন্ডোলা ছাড়া উপায় নেই। রিও দ্য মেন্ডিক্যান্টি, রিও দ্য স্যান্টা গুস্টিয়া পেরিয়ে গন্ডোলা প্রায় নিঃশব্দে এগিয়ে চলেছে। দু-ধারের বাড়িগুলোর দেওয়ালে লাগানো হলদেটে আলো জলে পিছলে পড়েছে। চারদিকের নৈশব্দ্য, আলোছায়া, ছোট জায়গার মধ্যে নৌকোর বাঁক নেওয়া, ছোট ছোট ব্রিজের তলা দিয়ে যাওয়া—সবমিলিয়ে সে এক অপার্থিব অভিজ্ঞতা। এ আলো-আঁধারিরও যেন ভাষা আছে। আর সেই ভাষাই ভেনিসকে এত রোমান্টিক করে তুলেছে।

আধঘণ্টা বাদে স্যান্টা ক্রোসে পৌঁছোল অনিলিখা। গন্ডোলাটাকে দাঁড়াতে বলে সিঁড়ি ধরে ওপরে উঠে এল। খানিকটা হেঁটে একটা বড় স্কোয়ারে এসে পৌঁছোল। তারপর স্কোয়ারের বাঁদিক দিয়ে চার্চের পাশ দিয়ে একটা রাস্তা ধরে

এগিয়ে গেল। রাস্তা ফাঁকা। আশপাশের সব বাড়ির আলো নিভে গেছে। কোনও দিকে কোনও লোক নেই। ভেনিসের রাস্তার আলোগুলো কেমন টিমটিমে হলুদ। তাতে ভালো করে দেখাও যায় না, আলো-ছায়ায় মেশানো রহস্যই তৈরি হয় বেশি। কলকাতার মতো রাস্তায় দু-একটা কুকুর থাকলেও হত। তবু মনে হত সঙ্গী আছে কেউ।

খানিকবাদে 24/1 খুঁজে পেল অনিলিখা। একটা অত্যন্ত পুরোনো বাড়ি। কেউ থাকে বলে মনে হয় না। এন্ট্রান্স একটা সরু গলি দিয়ে। ঢুকবে কি ঢুকবে না ভেবে গলিতে ঢুকেই পড়ল। নাহ্ এখানেও কেউ নেই। তাহলে কি পুরো ভাবনাটাই ভুল? দরজাটা ভেজানো। একটু ঠেলতেই খুলে গেল। আর এগোনো কি উচিত হবে?

কিন্তু অন্ধকারটা চোখে সয়ে আসতেই চমকে উঠল অনিলিখা। একটা রক্তের ধারা নীচে বয়ে গেছে। খানিকদূরে মেঝেতে একটা লোক উপুড় হয়ে পড়ে আছে। রক্তের দাগ দেখে মনে হচ্ছে বডিটা পরে টেনে এনে কেউ ভেতরে ফেলেছে। আস্তে আস্তে অনিলিখা এগিয়ে যায়, কাছে গিয়ে মুখটা দেখেই চমকে ওঠে। কলোসিয়ামের সামনে যাকে আশিসবাবু মিট করেছিলেন, তার বর্ণনা অনিলিখার ভালোই মনে আছে। ঠিক সেরকম। টাকমাথা, চাপদাড়ি, রিমলেস চশমা, চোখের পাশে আঁচিল। চারদিক খুঁটিয়ে দ্যাখে অনিলিখা,

কোথাও কিছু পড়ে আছে কি না। পায়ের জুতোটা খুলতেই একটা ছোট কাগজের টুকরো বেরোল। তাতে লেখা কয়েকটা শব্দ—কিউরিনা, বার্তোলো, মরিজিও, দেমেত্রিয়া, মার্গারিটা, ফ্যাবিও, হোসে, পাওলো, রবার্তো, ফেডেরিকা।

কাগজের টুকরোটা চট করে লুকিয়ে ফেলে অনিলিখা উঠে দাঁড়াল। এলোমেলো কিছু চিন্তা মনে জেগে ওঠে। বাড়িতে আর কেউ আছে কি? লোক ডাকবে? পুলিশে খবর দেবে? কীভাবে বোঝাবে এখানে আসার কারণ? আপাতত দ্রুত সরে যাওয়াটাই বোধহয় শ্রেয়। কাল লুকার সঙ্গে আলোচনা করে যাহোক কিছু করা যাবে। যে পথ দিয়ে এসেছিল, সে পথ দিয়েই চুপিসাড়ে বেরিয়ে গন্ডোলার কাছে চলে এল অনিলিখা। গন্ডোলায় উঠে বসতেই দাঁড় বাইতে শুরু করল লোকটা।

সাত

গ্র্যান্ড ক্যানেলের ওপর দিয়ে যে তিনটে ব্রিজ আছে তার মধ্যে সবথেকে পুরোনো আর বিখ্যাত হল দ্য রিয়াল্টো ব্রিজ। 1440 সালে এই ব্রিজ প্রথম তৈরি হয়। ব্রিজের মাঝের অংশ খোলা যেত যাতে বড় জাহাজ সেখান দিয়ে যেতে পারে। সে তো হল, কিন্তু কয়েকবছর যেতে না যেতেই দেখা গেল

ব্রিজ নড়বড়ে হয়ে পড়েছে, তাই আবার এই ব্রিজ তৈরি করা হল—যা শেষ হয় 1592-তে। মাইকেলেঞ্জেলো, প্যালাডিও, স্যানসোভিনোর মতো নামি আর্কিটেক্ট থাকতে ব্রিজের কাজ করতে দেওয়া হল এক অপেক্ষাকৃত অনামি আর্কিটেক্টকে—অ্যান্টনিও দ্য পন্টে। উনি যে খারাপ বানাননি তার প্রমাণ, আজ চারশো বছর পরেও ব্রিজ অক্ষত। সিঁড়ি দিয়ে ব্রিজে উঠতে হয়। ব্রিজের ওপরে দুদিকে সার দিয়ে দোকান। মাঝে খানিকটা খোলা অংশ, যেখানটায় দোকান নেই। সেখানেই দাঁড়িয়ে অনিলিখা। সঙ্গে আশিসবাবুও আছেন।

গতকালের ঘটনা অনিলিখা আশিসবাবুকে বলেনি। ছাতা আর কলোসিয়ামের মিনিয়েচার—দুটোই আশিসবাবুর প্রাপ্তি। তাই ঘটনাটা শুনে উনি ঠিক নার্ভাস হয়ে পড়বেন। হোটেল থেকেই আর বেরোবেন না।

সকালে স্থানীয় খবরের কাগজ দেখেছে অনিলিখা। তাতে ওই ঘটনার কোনও উল্লেখ নেই। কে ছিল ওই লোকটা? কেন বারবার অনিলিখা আর আশিসবাবুর সঙ্গে যোগাযোগ করছিল? কে-ই বা মারল লোকটাকে? জুতোর মধ্যে লুকিয়ে রাখা কাগজটারই বা কী অর্থ? গতকাল ওকে কেউ ঢুকতে বা বেরোতে দ্যাখেনি তো? একগাদা প্রশ্ন।

চারদিকে একবার তাকিয়ে নিল অনিলিখা। আশিসবাবু একটা স্যুভেনির শপে পেপার ওয়েটের দাম নিয়ে বেজায়

দরাদরি করছেন, আশেপাশের বেশিরভাগই ট্যুরিস্ট—আমেরিকান আর ফ্রেঞ্চই বেশি। কেউ সেরকমভাবে অনিলিখাদের লক্ষ করছে বলে মনে হল না।

ইতিমধ্যে আশিসবাবু ফিরে এসেছেন। গন্ডোলাব ছবিওয়ালা পেপার ওয়েটটা দেখিয়ে বলে উঠলেন,—ওনলি ওয়ান ইউরো। প্রথমে পাঁচ ইউরো চেয়েছিল।

'ওয়ান ইউরো!' চমকে ওঠে অনিলিখা। কালকের ঘটনার পর থেকে 'ওয়ান ইউরো' কথাটাকে রীতিমতো ভয় পায় অনিলিখা। তবে দোকানির মুখ দেখেই সংশয় ভাঙল। সে দূর থেকে আশিসবাবুকে উত্তেজিত হয়ে কী সব বলে যাচ্ছে। সেটা যে রেগে গিয়ে তা ইতালিয়ান না জানলেও বোঝা যায়।

ব্রিজ থেকে নেমে লাঞ্চের জায়গা খুঁজতে লাগল অনিলিখা। বাঁদিকে প্যালাজো লরেডান আর প্যালাজো ফারসেট্টি পড়ল। দুটোই দ্বাদশ বা ত্রয়োদশ শতাব্দীর। ভেনিসের বাইজানটাইন স্টাইলের স্থাপত্যের উদাহরণ। প্রাসাদের একতলায় আর দোতলায় বাড়ির পুরোটা জুড়ে পরপর লম্বা আর্চ। দোতলায় লম্বা টানা বারান্দা। ক্যানেলের ধারে অনেক লোকের যাতায়াত। তাই একটা সরু গলির মধ্যে একটা ছোট রেস্টুরেন্টে অনিলিখারা ঢুকল পিৎজা খেতে। এখানকার পিৎজা অবশ্য অন্যরকম খেতে। নীচের ক্রাস্টটা শক্ত রুটির মতো। পিৎজা

হয়তো ভালোই লাগত কিন্তু হঠাৎ অনিলিখা দেখল রেস্টুরেন্টের দরজা দিয়ে জার্মান ছেলেটা ঢুকছে, ঢুকে অন্য একটা টেবিলে গিয়ে বসল। অনিলিখা আড়চোখে তাকিয়েই বুঝতে পারল ছেলেটা একদৃষ্টে ওদের দিকেই তাকিয়ে আছে, এবং যাতে ওকে খেয়াল করা হয় সেরকমভাবেই তাকিয়ে আছে।

আশিসবাবুর অবশ্য সেসব দিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। দু-হাত আর দাঁতের সাহায্যে পিৎজা ছেঁড়ার আপ্রাণ চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন।

খানিকবাদে ছেলেটা একটা বিয়ার শেষ করে বিল মিটিয়ে উঠে দাঁড়াল। এবার সোজা অনিলিখাদের টেবিলের কাছে হেঁটে এসে বলে উঠল, 'টু ফোর টুয়েন্টি ফোর'—বলে একমুহূর্তও না দাঁড়িয়ে দরজা দিয়ে বেরিয়ে গেল।

ওর বিশাল চেহারাটা দরজার বাইরে উধাও হয়ে যাওয়ার পরপরই আশিসবাবু কাঁপা গলায় বলে উঠলেন,—আরে ওই ছেলেটা! মার্ডারার ছেলেটা! কী বলে গেল বলো তো?

অনিলিখার হাত-পা ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল। তারমানে ওকে ওই বাড়িতে ও শিওরলি দেখেছে। ইচ্ছে করে ফাঁসায়নি তো? অনিলিখারা ওর সম্বন্ধে বেশি জেনে ফেলেছিল বলেই উলটো ফাঁদে ওদের ফেলা হয়েছে? পিৎজাটা আর তেমন জমল না।

লাঞ্চ করে ওরা ফিরে চলল সেন্ট মার্কোস স্কোয়ারে।

ছোট-বড় গলি, স্কোয়ার, ছোট-ছোট ব্রিজ পেরিয়ে হেঁটে যেতে ঘণ্টাখানেক লাগল। আসলে ভেনিসের প্রত্যেকটা জায়গাই অন্যরকম। যেতে যেতে মাঝেমধ্যে দাঁড়িয়ে পড়তে হয়। এমনই অবাক করা দৃশ্য। কোনও বাড়ির পাশে হেলে যাওয়া চার্চ। সামনের বড় চত্বরে মধ্যযুগীয় চার্চ। কোনও কোনও জায়গায় আবার খালগুলো যেন নিজেদের মধ্যে কাটাকুটি খেলছে। আর সেই ছোট ছোট খোপে কোথাও স্যুভেনিরের দোকান, ক্যাফে তো কোথাও পরিত্যক্ত প্রাসাদ। বেশিরভাগ বাড়িতে জানালার বাইরে ছোট গ্রিলের খাঁচা। তাতে নানান ধরনের ফুল। রাস্তায় প্রচুর ট্যুরিস্ট। বাড়িগুলোর জানালা-দরজা সব বন্ধ। দেখে মনে হয় ভেনিসবাসী বলে কেউ নেই। এখানে সবাই বেড়াতে এসেছে।

সেন্ট মার্কোস স্কোয়ারে ঢোকার মুখে দুটো বড় বড় স্তম্ভ। একটায় ওপরে সেন্ট থিয়োডোরের স্ট্যাচু। অন্যটার ওপরে ভেনিসের সিম্বল—ডানাওয়ালা সিংহ। দুটোই 1125 সালে চিন থেকে আনা হয়। আগে অপরাধীদের এই দুই স্তম্ভের মাঝে ফাঁসি দেওয়া হত।

এই দুটো স্তম্ভ পেরোলে বিশাল স্কোয়ার। স্কোয়ারের শেষের দিকে বেল টাওয়ার। এটা ভেনিসের সব থেকে পুরোনো বেল টাওয়ার। প্রায় নশো সালে তৈরি এই বেলটাওয়ার অক্ষত ছিল 1902 সাল অবধি। 1902 সালে

এই বেলটাওয়ার ভেঙে পড়ে। আবার ঠিক একইরকম বেল টাওয়ার তৈরি করা হয়। বেল টাওয়ারের পাশেই সেন্ট মার্ক ব্যাসিলিকায় ঢোকার বিশাল লাইন। অনিলিখারা ওই লাইনে দাঁড়ায়।

—বুঝলেন আশিসবাবু, এটাই ভেনিসের ধর্মীয়, সামাজিক আর রাজনৈতিক কেন্দ্র ছিল হাজার বছর ধরে। 829 সালে ডজেরা সেন্ট মার্কের সমাধিস্থল হিসেবে এই চার্চ তৈরি করে। বহুবার এখানে আগুন লেগেছে। বহুবার সংস্কার হয়েছে। এই চার্চের গুরুত্ব কখনওই কমেনি। এখানে প্রচুর বিখ্যাত ছবি আছে। ঢোকার দরজায় ওপরে যে ছবিটা দেখছেন ওটা হল এল কিউরেনার 'লাস্ট জাজমেন্ট'।

বলতে বলতে অনিলিখা দেখতে পেল লাইনের পাশে একটা লোক খবরের কাগজ বিক্রি করছে। এটা ভেনিসের নামকরা পত্রিকা 'কমেস্টাই'-এর আফটারনুন এডিসন। তিন ইউরো দিয়ে কাগজটা কিনে এক ঝলক তাকাতেই যে খবরটা খুঁজছিল সেটা পেয়ে গেল অনিলিখা। কিন্তু এত বড় করে বেরোবে তা অনিলিখার ধারণা ছিল না। প্রায় অর্ধেক পাতা জুড়ে। ওপরে ওই ভদ্রলোকের ছবি। একটাই সমস্যা, লেখাটা ইতালিয়ানে।

আশিসবাবুকে নিয়ে লাইনের বাইরে বেরিয়ে আসে অনিলিখা। আশিসবাবু যথারীতি বিরক্ত।

—কী ব্যাপার বলো তো অনিলিখা। তোমাকে নিয়ে প্ল্যানমাফিক কিছু করার উপায় নেই। এই তো এতক্ষণ এই চার্চের ব্যাপারে এত ভালো ভালো কথা শোনাচ্ছিলে। এখন না দেখে বেরিয়ে যাচ্ছ।

—আপনাকে পরে বুঝিয়ে বলছি। আমাদের মহাবিপদ। আপাতত আমাকে ফলো করুন।

আশিসবাবু একটু থতোমতো খেয়ে অনিলিখার পিছু নিলেন।

—চলুন একটু গেল্যাটো খাওয়া যাক।

—এই যে বললে মহাবিপদ। এরমধ্যে আবার আইসক্রিম খাওয়ার শখ এল কোথা থেকে। কিছু বুঝি না বাপু। এর থেকে পাড়ার ন্যাড়ার সঙ্গে এলে ভালো করতাম।

—এইরকম মেঘলা দিনে গেল্যাটো খাওয়ার লোক বেশি নেই। আমার দরকার একটা নিউজের ইংরেজি ট্রান্সলেশন। তাও এমন একজনকে দিয়ে যে আমাদেরকে চেনে না।

ঠিক এরকমই একটা গেল্যাটোর দোকান খুঁজে পেল অনিলিখা খানিকটা হাঁটার পর। একা একজন আইসক্রিমের পসরা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আইসক্রিম খেতে খেতে গল্প জুড়ে দিল অনিলিখা। তারপর নিছক কৌতূহলের ভান করে কাগজের ওই খবরটার ব্যাপারে জিগ্যেস করল। লোকটাও খবরটাতে বেশ ইন্টারেস্টেড মনে হল। খবরের কাগজটা

নিয়ে কিছুক্ষণ পড়ার পর বলল,—এনার নাম রবার্তো। একটা সময় হার্ভাড না কোথায় অঙ্ক করাতেন। মাঝে মাথার গণ্ডগোল দেখা দেয়। কম্পিউটার, রোবট এসবের ওপর খুব রাগ ছিল। অনেকবার অনেক জায়গায় পার্সেল বোমা ফাটিয়ে এসবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। বেশ কিছু লোক হতাহতও হয়। বহুদিন ধরে বিভিন্ন দেশের পুলিশ একে খুঁজছিল। তা, পুলিশের হাতে ধরা পড়ার আগেই মার্ডার!—লোকটা থামল।

—আর কিছু লিখেছে?

—হ্যাঁ, লিখেছে পুলিশ নাকি একটা মেয়েকে খুঁজছে। ইতালিয়ান নয়। ওখানে মার্ডারের সময় ছিল।

আশিসবাবুর হাত থেকে আইসক্রিম পড়ে যাচ্ছিল। সামলে নিয়ে বলে উঠলেন,—কে তুমি নাকি?

নেহাতই বাংলায় বলেছিলেন। না হলে মুশকিলে পড়তে হত।

অনিলিখা আশিসবাবুর কথার প্রত্যুত্তরে সপ্রতিভভাবে ইংরেজিতে বলে উঠল,—কতরকম লোক থাকে। ভাবা যায় সায়েন্টিস্ট হয়ে সায়েন্সের বিরোধিতা করতেন?

লোকটার সঙ্গে আরও দু-একটা কথা বলার পরে 'গ্র্যাৎসি মিলে' বা অসংখ্য ধন্যবাদ বলে অনিলিখারা হোটেলের পথে পা বাড়াল।

আট

'জেনুয়া'-কে বলা হয় ইতালির সাংস্কৃতিক রাজধানী। এমনকী ইউরোপেরও সাংস্কৃতিক কেন্দ্র বলে স্বীকৃত। বহু পুরোনো শহর। কখনও স্পেনের অধীনে, কখনও অস্ট্রিয়ার অধীনে, কখনও বা ফ্রান্সের অধীনে। 1814 সালে ফ্রান্সের থেকে স্বাধীনতা পায়। একদিকে ভূমধ্যসাগর, অন্যদিকে অ্যাপেননাইন পর্বতশ্রেণি। পুরো শহরটাই পাহাড়ি। নানান লেভেলে বাড়ি। কিছু বাড়ি সমুদ্রতলে, তো কিছু বাড়ি পাহাড়ের ওপরে।

লুকার পরামর্শমতো সেদিন রাতেই ভেনিস থেকে জেনুয়া চলে এসেছে অনিলিখারা। ওরা উঠেছে শহরের ভিয়া ভ্যালভি এলাকার একটা মাঝারি হোটেলে। এটা শহরের খুব পুরোনো এলাকা। শহরের অন্যতম প্রধান রেলস্টেশন প্রিন্সিপিয়া থেকে দু-মিনিটের হাঁটাপথ। পাথর বসানো ফুটপাথ, রাস্তা। রাস্তার দু-ধারে ওপরে-নীচে চড়াই রাস্তা চলে গেছে। বাড়ি আর মিউজিয়াম হাত ধরাধরি করে রাস্তার দু-ধারে।

সকালে হোটেলের ব্রেকফাস্ট রুমে বসে টিভির পরদায় অপ্রত্যাশিতভাবে লুকার দেখা পেল অনিলিখা। লুকা যে স্থানীয় টিভি চ্যানেলে একটা আই.কিউ টেস্ট-এর শো হোস্ট করে তা জানা ছিল না। প্রোগ্রামটা বেশ ইন্টারেস্টিং। পুরো ইউরোপ থেকে যে-কেউ অংশগ্রহণ করতে পারে। নানান

জটিল ধাঁধা, বিভিন্ন ধরনের নকশার মধ্যে মিল খুঁজে বার করা—এসব তো আছেই, সঙ্গে আরও মজার অনেক কিছু হয়। যেমন, নতুন ধরনের সমস্যায় পড়লে তার থেকে কত তাড়াতাড়ি কে বেরোতে পারে—তা দেখা হয়।

আজকের প্রোগ্রামে একজন লোককে একটা পুরো অন্ধকার অচেনা ঘরে ঢুকিয়ে একটা দেশলাই-এর বাক্স বার করে আনতে বলা হল। ঘরে ঢোকার আগে তাকে শুধু ওই ঘরের কোথায় কি আছে তার চাররকম সম্ভাবনা দেখানো হয়েছিল। লোকটার কাজ হল ওই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখে এবং ঘরের ছবি মনে রেখে তিন মিনিটের মধ্যে ওই দেশলাই বাক্স উদ্ধার করা।

লুকা অনুষ্ঠানটার পরিচালক। ওর নিজের আই.কিউ-ও সাংঘাতিক বেশি। 160-এর কাছাকাছি। সে কারণেই ওকে হয়তো হোস্ট সিলেক্ট করা হয়েছে।

উত্তর ইতালিতে ব্রেকফাস্টে সবাই নিরামিষই খায়। ক্রঁয়স্যা, চিজ, পাঁউরুটি, ফোক্যাসিয়া, আর কফি খেয়ে ওরা বেরোল জেনুয়া ঘুরতে। রোজই কিছু না কিছু ঘটনা ঘটছে। আজকে আবার কিছু না হয়! কলম্বাস জেনুয়ার লোক ছিলেন। আমেরিকা আবিষ্কারের পর তাঁর রোজগারের এক দশমাংশ জেনুয়াবাসীর উদ্দেশ্যে ব্যাঙ্কে রেখে যান।

কলম্বাসের বাড়িটা ভিয়া ভ্যালভি থেকে হেঁটে পনেরো

মিনিট। পথে ভিয়া গ্যারিব্যাল্ডি রাস্তা পড়ে। এটা ওয়ার্ল্ড হেরিটেজ সাইট। ষোলো শতাব্দিতে জেনুয়ার অভিজাত সব পরিবার এখানে থাকত। রাজা এলে এসব প্রাসাদে তাঁর থাকার ব্যবস্থা করা হত। ভিয়া গ্যারিব্যাল্ডির দু-ধারে প্যালাজো রসো, প্যালাজো রিয়াল। টাসকানি থেকে আনা মার্বেলের প্রাসাদ। চারশো বছরেও প্রাসাদের জৌলুস কমেনি!

প্রাসাদের মধ্যে বিশাল বিশাল ইতালিয়ান ফ্রেস্কো পেন্টিং—রুবেনস, ভ্যান ডিক, বেলিনি, বটিস্যেলি—এমন সব নামি আর্টিস্টদের আঁকা। এসব দেখতে দেখতে বিরক্ত হয়ে উঠে হঠাৎ আশিসবাবু কি খেয়ালে অনিলিখাকে জিগ্যেস করলেন, আচ্ছা সেদিন ওই কলোসিয়ামের মূর্তিটার মধ্যে যে ছিপটা পেয়েছিলে, সেটার কী হল?

—ছিপ নয়, চিপ। মাইক্রোচিপ। আমি আপনাকে পরে বলব।

একটু থেমে অনিলিখা ফিসফিসিয়ে বলে,—আমাদের একজন ফলো করছে—তা কি টের পেয়েছেন?

—ফলো? সে কী? কোথায়? কীরকম দেখতে? আশিসবাবু এমন হইহই করে উঠলেন যে একজন লোক দ্রুত ওই ঘর থেকে অন্য ঘরে চলে গেল। অনিলিখাও নিশ্চিন্ত হল যে, লোকটা সত্যি ওদের ফলো করছিল। হোটেল থেকে ওই

লোকটাকে পিছু নিতে দেখেছে। কী চায় কে জানে!

প্যালাজো রিয়াল থেকে বেরিয়ে আরও খানিকটা হেঁটে ওরা কলম্বাসের বাড়ি পৌঁছোল। বাড়িটা সংস্কার করে খানিকটা অংশ একই রকম ভাবে সংরক্ষিত করা হয়েছে। তাতে কলম্বাসের ব্যবহৃত নানান জিনিস আছে। এই প্রথম একজন লোক পাওয়া গেল যার সম্বন্ধে আশিসবাবু বেশ ভালো ধারণা পোষণ করেন। ঘরটা দেখার পর বলে উঠলেন,—ভাবা যায়! সেই হাজার হাজার বছর আগে নৌকো চেপে এক দেশ থেকে আরেক দেশে চলে গিয়েছিল। ইনি না আবিষ্কার করলে আমেরিকা হয়তো আমেরিকাই হয়ে উঠত না।

অনিলিখা সম্মতি জানিয়ে বলে উঠল,—নৌকো মানে এমনি নৌকো নয়। স্প্যানিশ আর্মাডা—বড় জাহাজ। আর হাজার হাজার বছর নয়, মোটামুটি পাঁচশো বছর আগে, 1492-তে। তবে তখনকার দিনে সমুদ্রে চার হাজার মাইল যাওয়া—অনিশ্চিত পথ পেরিয়ে—এতে যে বুকের পাটা লাগে, তা না বললেই নয়। যাঁরা পাঠিয়েছিলেন—স্পেনের রাজা ফার্ডিন্যান্ড আর রানি ইসাবেলাও নিশ্চিত ছিলেন যে ওই জাহাজ আর ফিরবে না। সমুদ্রে ডুবে যাবে। তাই এমন কন্ট্রাক্ট সাইন করেছিলেন কলম্বাসের সঙ্গে যাতে কলম্বাসকে অনেক কিছু দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল। লাভের দশ

শতাংশ, যে দ্বীপ আবিষ্কার করবে তার দশ শতাংশ—ইত্যাদি। তা একেই বলে ভাগ্য। কলম্বাস শুধু দ্বীপ নয়, একটা মহাদেশ আবিষ্কার করে ফিরে এলেন।

কলম্বাসের বাড়ির পাশে পুরোনো শহরের প্রাচীর। এই একটা জায়গাতেই খানিকটা অংশ অক্ষত আছে। আগে ইতালির প্রত্যেকটা শহর দেওয়াল দিয়ে ঘেরা থাকত। তারই সামান্য অবশেষ। জেনুয়ার সঙ্গে পিসা, পিসার সঙ্গে ভেনিস—সারাক্ষণ যুদ্ধবিগ্রহ চলত। জেনুয়া ছিল তখনকার বেশ নামকরা বন্দর, ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্র। তাই দেওয়াল দিয়ে শহরকে সুরক্ষিত করা ছিল। কখন কারা আক্রমণ করে বসে!

ওরা পুরোনো দিনের সেই দেওয়াল দেখছে, হঠাৎ প্রশ্ন এল পাশ থেকে—'বাঙালি?'

যিনি প্রশ্ন করেছেন তাঁর কথার টান শুনেই বোঝা যায় বাংলাদেশি। গায়ে রংচঙে শার্ট। কালো ছোটখাটো চেহারা। ছাগুলে দাড়ি। ভদ্রলোকের সঙ্গে আলাপ হল অনিলিখাদের। এখানে প্রায় কুড়িবছর আছেন। রাজশাহি থেকে এসে আফ্রিকাতে কয়েকবছর ছিলেন। তারপর ইতালিতে চলে আসেন। গাড়ি চালাতেন।

শেষ কয়েকবছর এখানকার বড় ব্যাঙ্ক 'ইনটেসা স্যানপাওলো'-র চিফ এক্সিকিউটিভ অফিসারের গাড়ি চালাতেন। দু-মাস আগে ওই CEO হঠাৎ দিন সাতেকের জন্য উধাও

হয়ে যায়। পুলিশের সন্দেহ হয় ওনার ওপর। জেল হাজতে সাতদিন অকথ্য মারধর করা হয়। তারপর হঠাৎ একদিন ছাড়া পান। ওনার মনিব পাওলো নাকি বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিলেন। ফিরে এসেছেন।

ভদ্রলোক এখন আর গাড়ি চালান না। ছোট একটা বাংলাদেশি রেস্টুরেন্ট খুলেছেন। তাতে যাওয়ার নিমন্ত্রণ জানিয়ে গেলেন ওদের।

কলম্বাসের বাড়ির পাশেই ভিয়া সেত্তেম্বরে। জেনুয়ার বড় রাস্তা। দু-ধারে বড় বড় দোকান। তারমধ্যে বাটার জুতোর দোকান আছে। সেই রাস্তা দিয়ে যেতে যেতে একটা ট্যাবাচ্চি থেকে কয়েকটা ম্যাগাজিন কিনে নিল অনিলিখা। কয়েকটা জিনিস জানা দরকার। পাওলোর মতো আরও কেউ ইদানীং কিছুদিনের জন্য হারিয়ে গিয়েছেন কিনা। তারা ফিরে এসে কী করছেন!

ভিয়া সেত্তেম্বরের ওপর ফ্যাশন ডিজাইনার জারার একটা বিশাল শো-রুম। ভিতরে ঢুকে জুতো কিনতে গিয়ে টিভির দিকে চোখ পড়ল। বিবিসি-তে নিউজ দেখানো হচ্ছে ইউনাইটেড নেশনস FAO-এর ওপর। যার পুরো নাম হল ফুড অ্যান্ড এগ্রিকালচার অর্গানাইজেশন। এদের কাজ সারা পৃথিবীতে খাবার জোগান নিশ্চিত করা—লোকে যাতে অভুক্ত থেকে না মরে তা দেখা। এদেরকে রিসেন্টলি একটা বিশাল

বাজেট দেওয়া হয়েছে আফ্রিকায় আর অনুন্নত কিছু দেশে কাজ করার জন্য। তাই নিয়ে এদের বর্তমান ডাইরেক্টর জেনারেলের সঙ্গে কথা হচ্ছে। ব্রাজিলিয়ান। নাম হোসে গ্র্যাজিয়ানো। হ্যাঁ, এর সঙ্গেই সেদিন কথা বলছিল ওই জার্মান ছেলেটা। লোকটার চাউনি কেমন যেন অস্বাভাবিক। ইন্টারভিউয়ের সময়ে সব ডেটা কণ্ঠস্থ। একের পর এক বিশাল বিশাল অঙ্কের সংখ্যা যন্ত্রের মতো বলে যাচ্ছে। কীভাবে কোথায় ইনভেস্ট করবে, কোন দেশে কত কর্মীসংখ্যা হবে, ক'টা অফিস থাকবে সব মুখস্থ। হয়তো খুবই মেধাবী লোক হবে।

নয়

হোটেলের ঘরে ফিরে পরদা সরিয়ে, খাটের নীচে ঢুকে, আলমারি খুলে সব ভালো করে চেক করতে শুরু করল অনিলিখা, ওর মন বলছে ওদের ওপর সমানে লক্ষ রাখা হচ্ছে। বেশ খানিকক্ষণ খোঁজার পর যন্ত্রটা মিলল। যন্ত্র মানে যাকে বলে বাগ। পড়ার টেবিলের নীচে লাগানো ছিল। দেখে স্ক্রু-র মতো মনে হয়। অথচ, অন্যপ্রান্তে কেউ ঘরের প্রত্যেকটা কথা শুনতে পাচ্ছিল। বাগটা খুলে ফেলল

অনিলিখা।

পরদাটা টেনে ল্যাপটপটা ইন্টারনেটে কানেক্ট করল। ব্যাগ থেকে বের করে নিল সেদিনের পাওয়া সেই কাগজটা। নামগুলো টাইপ করে সার্চ শুরু করল ইন্টারনেটে। নামগুলোর অনেকগুলোই খুব কমন ইতালিয়ান নাম। পুরো নামও নেই। তবু ঘণ্টাখানেকের মধ্যে ওই নামগুলোর মধ্যে একটা যোগসূত্র খুঁজে পেল অনিলিখা।

এরা সবাই বিখ্যাত লোক। কেউ ফেডেরাল রিজার্ভের চেয়ারম্যান তো কেউ কোনও বড় গাড়ির কোম্পানির মালিক। কেউ ইউরোপিয়ান সেন্ট্রাল ব্যাঙ্কের প্রেসিডেন্ট তো কেউ কোনও বড় মিডিয়া হাউসের অধিকর্তা। অর্থাৎ, প্রত্যেকেই শুধু ইতালির নয়, সারা বিশ্বের মধ্যে প্রভাবশালী লোক। আরেকটা মিল। এদের মধ্যে অন্তত চারজন কাউকে কিছু না বলে গত কয়েকমাসে একবার ছুটি নিয়েছিল। সে সময় এরা একাই গিয়েছিল আর কয়েকদিন বাদে ফিরেও এসেছিল। ঠিক যেভাবে পাওলো উধাও হয়ে গিয়েছিল। তবে এরা নিজেরা এটাকে ছুটি কাটাতে যাওয়া বলায় কেউ বিশেষ মাথা ঘামায়নি। সব থেকে বড় কথা হল, এদের প্রত্যেকে যে জায়গায় ছুটি কাটাতে গিয়েছিল সেই জায়গার নামটা অনিলিখার পরিচিত। পোর্টোফেনি। আগামীকাল অনিলিখারাও সেখানে যেতে চলেছে।

দশ

জেনুয়া থেকে স্যান্টা মার্গারিটা লোকাল ট্রেনে দেড় ঘণ্টার পথ। স্যান্টা মার্গারিটা থেকে লঞ্চে যেতে হবে পোর্টোফেনি। লুকার পাঠানোর লঞ্চই অপেক্ষা করবে স্যান্টা মার্গারিটার জেটিতে।

জেনুয়া থেকে স্যান্টা মার্গারিটা পুরো পথটাই সমুদ্রের ধার দিয়ে। বেশিরভাগ সময়ে ট্রেন চলেছে টানেলের মধ্য দিয়ে লুকোচুরি খেলতে খেলতে। পাহাড় কেটে এই রেলরাস্তা তৈরি করা একশো পঞ্চাশ বছর আগে সোজা কাজ ছিল না।

—কী আশিসবাবু, কীরকম লাগছে? একদিকে ভূমধ্যসাগরের নীল জল, অন্যদিকে পাহাড়ের পর পাহাড়। এই পুরো এলাকাটা ইতালিয়ান রিভিয়েরার মধ্যে পড়ে। উত্তর দিকে এই সমুদ্রের ধার বরাবর গেলে ফ্রান্সে পৌঁছে যাবেন ঘণ্টাখানেকের মধ্যে। পরপর পড়বে মোনাকো মন্টে কার্লো, নিস, কেন্‌স। আগে ওই সব এলাকা জেনুয়া প্রজাতন্ত্রের মধ্যেই ছিল। পরে ফ্রান্সের মধ্যে চলে যায়। আমরা অবশ্য এখন উলটোদিকে যাচ্ছি। যাচ্ছি দক্ষিণের পিসার দিকে।

—তা পোর্টোফেনি-ও কি ওই রিভারের মধ্যে?

—রিভার নয়, রিভিয়েরা। ইতালিয়ানে যার অর্থ সমুদ্রের

ধারের একফালি জায়গা। পোর্টোফেনি রিভিয়েরার মধ্যে। রোমান সভ্যতার সময়েও এই ছোট গ্রামে জনবসতি ছিল, জেলেদের গ্রাম ছিল। ওই সময় ওখানে প্রচুর ডলফিন পাওয়া যেত। তাই ওরা নাম দিয়েছিল পোর্টাস ডেলফিনি। তার থেকেই আজকের পোর্টোফেনি নামটা এসেছে। ওখানে মূলত ইতালিয়ান ধনকুবেরদের বাগানবাড়ি।

—তা তোমার এই বন্ধুটিও কী বিশাল ধনী না কি?

—হ্যাঁ, ও নিজে খুব বড় নিউরোসার্জেন। তা ছাড়া ওর ঠাকুরদার টাসকানিতে বিশাল পাথরের ব্যবসা ছিল। তাই বংশানুক্রমেও অনেক সম্পত্তি পেয়েছে।

—তা, লোক কেমন?

—অসম্ভব ভালো। তবে...। একটু থেমে অনিলিখা কী ভেবে ফের বলে,—ওকে যা বলার আমিই বলব। আপনি কিছু বলবেন না।

অনিলিখা জানলা দিয়ে বাইরের দিকে তাকাল। মেঘলা আকাশ। দূরে পাহাড়ের ওপর ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে বাড়িগুলো। তাদের ওপরে গাছগুলোকে ছাতার মতো দেখাচ্ছে। এখানে শীত, গরম দুটোই কম পড়ে। তাই বাড়িগুলোতে বড় বড় ব্যালকনি বা টেরেস। লাল টালির ছাদ। বেশিরভাগ বাড়িরই হলুদ বা কমলা রং। সবুজ খড়খড়ির জানলা। অনেক বাড়িতে জানলা দরজা নকল—পেন্ট করা। কিন্তু এমন ভাবে

আঁকা যে দূর থেকে আসলের মতো মনে হয়।

অনিলিখার মনে হচ্ছে একটা বড় রহস্যের মধ্যে ও অলরেডি জড়িয়ে গেছে। একটা অদ্ভুত আশঙ্কা হচ্ছে। কিন্তু মেঘ কাটিয়ে নীল আকাশ না দেখা পর্যন্ত ও ছেড়ে দেবে না।

খানিকক্ষণের মধ্যে স্যান্টা মার্গারিটা স্টেশন এসে গেল। নীচু প্ল্যাটফর্ম। নীল বোর্ডের ওপরে সাদা রঙে স্টেশনের নাম লেখা। স্টেশনে আরও দু-তিনজন লোক আছে। স্টেশনের মধ্যে দিয়ে বেরিয়ে আসতে টিকিট কাউন্টার পড়ল। সেখান থেকে বেরিয়েই সামনে রাস্তা। স্টেশনটা শহরের ওপরের দিকে। তাই দূরে বাড়ির ফাঁক দিয়ে ভূমধ্যসাগরের নীল জল দেখা যাচ্ছে। এ জায়গার সমুদ্রকে লিগুয়ারিয়ান সি বলে। আবহাওয়া অত্যন্ত মনোরম। উষ্ণতা 13-14 ডিগ্রির মতো। ফুরফুরে হাওয়া বইছে। দূরে কমলা হলুদ লাল-নানারঙের বাড়িগুলোকে প্রকৃতি যেন নিজের হাতে পাম গাছগুলোর মধ্যে মধ্যে সাজিয়ে রেখেছে।

—বুঝলে অনিলিখা, এসব জায়গায় থাকতে হয়। ব্যালকনিতে বসলে সারাদিন কেটে যাবে। কী সুন্দর নীল জল-আকাশ, কী চুপচাপ।

অবশ্য আশিসবাবুর মতো লোক থাকলে জায়গাটা যে আর চুপচাপ থাকবে না তা অনিলিখা জানে। এই তো আগের

বছর কালীপুজোর পরের রাতের ঘটনা। রাত তিনটের সময়ে পাড়ার কয়েকজন ছেলেকে নিয়ে দেদার চকলেট বোমা ফাটিয়েছিলেন। থানা থেকে পুলিশ পর্যন্ত এসে গিয়েছিল। ওসি নাকি থানাতে ঘুমোতে পারছিল না। কিছু বাজি বাজেয়াপ্ত করে নিয়ে গেলেও আশিসবাবুকে ধরে নিয়ে যায়নি। আশিসবাবু নাকি ওদের বুঝিয়ে ছিলেন যে শব্দ বাজির নিষেধাজ্ঞাটা শুধুমাত্র কালীপুজোর দিন অ্যাপ্লিকেবল। অন্য দিনে নাকি কোনও অসুবিধে নেই। এরকম আরও অনেক ঘটনা আছে। চুপচাপ আর আশিসবাবু—দুটো যেন সম্পূর্ণ বিপরীত শব্দ।

তবু সম্মতি জানিয়ে অনিলিখা ফোন করল লুকাকে,—লুকা, আমরা এসে গেছি, স্টেশনের সামনে। কোনদিকে যাব?

লুকার গলাতেও উত্তেজনা,—আমি ঠিক পাঁচমিনিটে পৌঁছোচ্ছি। স্টেশন থেকে বেরিয়ে ডানদিকের রাস্তাটায় এগিয়ে যাও। তারপর বাঁদিকে টার্ন নিলেই বিচ দেখতে পাবে। ওখানেই জেটিতে আমার বোট থাকবে।

খুঁজে বের করতে অনিলিখাদের একদমই অসুবিধে হল না। রাস্তা নীচের দিকে নেমে গেছে। তিন-চার মিনিটের হাঁটা পথ। তার পরেই প্রসারিত বিচ। বিচে পরপর চেয়ার পাতা। মেঘলা বলেই হয়তো বিচে বেশি লোক শুয়ে নেই। ডানদিকে জেটি। সেখানে নানান ধরনের বোট, প্রমোদতরী লাগানো।

হঠাৎ খেয়াল হল একটা বিশাল প্রমোদতরী এগিয়ে আসছে। লুকা ডেকে দাঁড়িয়ে হাত নাড়ছে।

পাশ থেকে আশিসবাবু ফিসফিসিয়ে বলে উঠলেন,—এ তো সিনেমাকেও হার মানায়। কী বিশাল! এটা ওর প্রাইভেট বোট?

—হ্যাঁ। এতটা বড় হবে তা অনিলিখাও আশা করেনি। বোট থেকে নেমে লুকা এগিয়ে এল ওদের দিকে।

অনিলিখার হাত ধরে লুকা বলে উঠল,—ওয়েলকাম টু ইতালিয়ান রিভিয়েরা। এখানে ক'দিন থাকলে আর যেতে ইচ্ছে হবে না। চলো বাইরে ডেকে বসব।

ওরা বোটের সামনের দিকের খোলা জায়গায় চেয়ারে গিয়ে বসল। ইঞ্জিন চালু করতেই জলে দাগ কেটে তিরের মতো লুকার বোট এগিয়ে চলল। বাঁদিকে আফ্রিকা। তাই ওদিকে তাকালে কিছুই দেখা যায় না। নীল জল আর আকাশ দূরে মিলে গেছে। ডানদিকে সবুজে ঢাকা পাহাড়। মাঝে মাঝে বিশাল বিশাল প্রাসাদ উঁকি মারছে। একটাকে দেখিয়ে লুকা বলে ওঠে,—ওটা ইতালির প্রেসিডেন্টের বাড়ি। প্রেসিডেন্ট মাঝেমধ্যে এখানে এসে থাকেন।

অনিলিখা জিগ্যেস করল,—তোমারও ওরকম বাড়ি

না কি?

—নাহ্, আমারটা ক্যাসল। একটা পুরোনো ক্যাসল কিনে তাকে খানিকটা রেনোভেট করে নেওয়া হয়েছে। অনেকগুলো ঘর। তোমরা আমার বাড়িতেই থাকতে পারতে। অত করে বললাম!

—না, না, হোটেলে থাকব। গল্প করতে তোমার বাড়ি চলে আসব। তুমি বুকিং করে রেখেছ তো?

—হ্যাঁ, হ্যাঁ, এখানে বেশি হোটেল নেই। তা একটা ভালো জায়গাতেই বুকিং করেছি। তোমার আর দাদুর জন্য।

দাদু কথাটা যে আশিসবাবুর পছন্দ হয়নি তা বলাই বাহুল্য। তবে এই বোটে যাওয়ার আনন্দে উনি এতটাই মশগুল যে গায়ে লাগালেন না।

খানিকবাদে লুকার বোট একটা জেটিতে এসে লাগল। সমুদ্র থেকে খানিকটা ভেতরে ঢুকে এসেছে। চারদিকে জেলেদের বোট। কিছু বড় বড় প্রমোদতরী। জেটির চারদিকে নানা রঙের ছবির মতো বাড়ি। এগুলো সব ছোটখাটো হোটেল। নীচে লাইন দিয়ে ক্যাফে, ট্যাবাচ্চি, স্যুভেনির শপ। ট্যাবাচ্চি হল ছোট ছোট স্টেশনারি দোকান যাতে সিগারেটও পাওয়া যায়।

একটা চড়াই রাস্তা ওখান থেকে সোজা পাহাড়ের ওপরের দিকে উঠে গেছে। জেটিতে লুকার মহার্ঘ পোর্স গাড়ি অপেক্ষা

করছিল। ওরা সবাই মিলে ওটাতে উঠে বসল।

অনিলিখাদের হোটেলে পৌঁছোতে মিনিট দশেক লাগল। পাহাড়ের ওপর দিকে হোটেলের বিশাল সাদা বিল্ডিং। কথা হল, বিকেল চারটের সময়ে অনিলিখাদের নিয়ে যেতে গাড়ি আসবে।

এগারো

বহুদিন বাদে আজকে আশিসবাবু সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত। পোর্টোফেনি ছোট জায়গা। সম্ভ্রান্ত লোকেদের বাস। এখানকার পুলিশ কীরকম সক্রিয় গাড়িতে আসার সময়ে তারও প্রমাণ পেয়েছেন। রাস্তায় থুতু ফেলেছিলেন বলে ওনার হয়ে লুকাকে ফিফটি ইউরো ফাইন দিতে হয়েছে। হোটেলটাও বেশ জম্পেশ। পাম গাছে ঘেরা একটা সুন্দর পুলও আছে। দুপুরে স্প্যাগেটি খেয়ে বেশ খানিকটা দিবানিদ্রা দিলেন আশিসবাবু। অনিলিখা এর মধ্যে জেটি থেকে একটা চক্কর মেরে এসেছে। যেতে আধঘণ্টা লেগেছিল। উঠতে প্রায় একঘণ্টা। চড়াই পথ। ঘুরে ঘুরে আসতে হয়।

যত ট্যুরিস্টের ভিড় জেটির কাছে। রাস্তাটা ধরে খানিকটা ওপরে উঠে এলেই চারদিক শুনশান। তখন রীতিমতো গা

ছমছম করে। দুদিকে ঘন বন। নানান রঙের, নানান টাইপের গাছ। মেডিটেরিয়ান ক্লাইমেট হলে যা হয়। আধমাইল হাঁটলে একটা বাড়ি চোখে পড়ে। যে জিনিসটার খোঁজে গিয়েছিল, তা অবশ্য ও পেয়ে গেছে। ওই কাগজে যে ন'জনের নাম লেখা ছিল তারা প্রত্যেকেই গত তিনমাসে এখানে এসেছে। এখানে তিনটে বড় হোটেল। তাদের সঙ্গে আর পুলিশের সঙ্গে কথা বলে এ ব্যাপারে নিশ্চিত হয়েছে।

প্রশ্নটা হল, তাতে কী এসে যায়? তারা এখানে এসেছিল, তারপর আবার ফিরে গেছে—এখনও বহাল তবিয়তে আছে—এতে রহস্যের কিছুই নেই। এখানে তো এমনিতেই বড়লোকেরা ছুটি কাটাতে আসে। তবু, মনে কিছু একটা খচখচ করছে। এদের কারুর সঙ্গে কথা বলতে পারলে খুব ভালো হত।

হোটেলে ঢুকে ফ্রেশ হয়ে নিল অনিলিখা। তারপর নিজের আর আশিসবাবুর জন্য দুটো ইংলিশ টি-এর অর্ডার দিতে না দিতেই ঘরের ফোনটা বেজে উঠল। লুকার গাড়ি পৌঁছে গেছে। লুকা ওর ড্রাইভারকে দিয়ে গাড়ি পাঠিয়েছে।

হোটেল থেকে লুকার বাড়ি পৌঁছোতে পৌনে ছ'টা হয়ে গেল। এখন বেলা বেশ বড়। তাই ছ'টাতেও বেশ আলো রয়েছে। লুকার বাড়িটা বিশাল। উঁচু পাথরের পাঁচিল। গেট থেকে পাথর বাঁধানো রাস্তা বাড়ির দরজার দিকে এগিয়ে গেছে। দু-ধারে বাগান। রাস্তাটা গিয়ে শেষ হয়েছে বাড়ির

সিংহ দরজায়। দরজাটা রিমোট দিয়ে খুলে গাড়ি রেখে ওরা ভেতরে ঢুকল। এবার বাড়িটার মধ্যযুগীয় ক্যাসেলের চেহারাটা দেখতে পাওয়া গেল। বিশাল উঁচু সিলিং। বিশাল ড্রয়িংরুমটা প্রায়ান্ধকার। ওপরের দিকে পরপর রঙিন কাচের জানালা। দুদিক দিয়ে সিঁড়ি ওপরে উঠে গেছে। ড্রয়িংরুমের দুদিকে পরপর আরও ঘর।

অনিলিখারা কাঠের কাজ করা সোফায় এসে বসল। সামনে বেশ কয়েকটা উলঙ্গ শিশুর পাথরের মূর্তি, তার মধ্যে ফোয়ারা।

মিনিটতিনেক বাদে লুকার পায়ের শব্দ পাওয়া গেল। সিঁড়ি দিয়ে পায়ের শব্দটা নীচের দিকে নামার সময় ওর চেহারাটা দেখা গেল। ওর গায়ে দামি সিল্কের ড্রেসিংগাউন।

একটা চুরুট ধরিয়ে পাশের সোফায় বসে লুকা প্রথমেই যে প্রশ্ন করে বসল তার জন্য অনিলিখা একেবারেই প্রস্তুত ছিল না।

—ওদের খোঁজ নেওয়ার জন্য কেন শুধু শুধু কষ্ট করে হোটেল আর পুলিশ স্টেশন গিয়েছিলে? আমাকে জিগ্যেস করলেই পারতে। এখানে কিছু হল, আর আমি জানব না! তা ওদের নাম হঠাৎ কোত্থেকে পেলে?

ভেনিসের ঘটনাটা অনিলিখা যেটুকু দরকার সেটুকু বলে গেল। ছাতা কেনা থেকে শুরু করে, রাত একটায় ওই

বাড়িতে পৌঁছোনো আর ডেডবডি দেখতে পাওয়া। আগে ফোনে সংক্ষেপে বলেছিল, কাগজটা পাওয়ার কথা তখনও বলেনি।

গম্ভীর হয়ে সব শোনার পর লুকা বলে উঠল,—ওখানে অত রাতে তোমার যাওয়া অত্যন্ত বড় ভুল হয়েছিল অনিলিখা। তোমাকে তো আগেও বলেছি যে পুলিশও এতে যুক্ত আছে। ওই লোকটাকে খতম করেছে নির্ঘাত ইন্টারপোল। আর তারাই তোমাকে ওখানে দেখেছে। ওরা চাইলে যে কাউকে ধরতে পারে। প্রত্যেক মুহূর্তে তোমার ওপর নজর রাখতে পারে। যাই হোক পুলিশের কাছে আর খবরদার যেও না। তা ছাড়া ইতালিতে মাফিয়াদের রাজত্ব চলে। কি দরকার এসব ঝামেলায় জড়ানোর!

—তা, এদের কেউ কি তোমার এখানেও এসেছিল?

—দ্যাখো, পোর্টোফেনি ছোট জায়গা। ইতালিতে কেন পুরো ইউরোপে আমাকে সবাই মোটামুটি চেনে। এখানে বেড়াতে এসে আমার সঙ্গে দেখা করবে না! তা হয় নাকি! যাক, এসব কথা ছাড়ো। আমার তৈরি রোবট তোমাদের দেখাই।

—রোবট? আশিসবাবু প্রচণ্ড উত্তেজিত।

—হ্যাঁ, দাদু। আমার একটা রোবট আছে। আসলে একা একা থাকি। কথা বলার লোকও পাই না। তাই ভাবলাম

রোবট তৈরি করি। দেখাচ্ছি।

অনিলিখারা উঠতে যাচ্ছিল। হাত তুলে বসতে বলল লুকা।

—আরে, জিওভানি এখানেই চলে আসবে। জিও বলে ডাকি। ওকে আমি অলরেডি ডেকে নিয়েছি। বলতে না বলতেই একজন সৌম্যদর্শন লোক পাশের ঘর থেকে দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। চট করে বোঝা না গেলেও একটু দেখলেই পরিষ্কার বোঝা যায় সে যাতে মানুষের মতো দেখতে হয় তার অনেক চেষ্টা সত্ত্বেও খুঁত রয়ে গেছে। হাঁটা চলাতেও বেশ খানিকটা আড়ষ্টতা আছে। কলকবজা সেন্সরের সাহায্যে কি মানুষের হাঁটার স্বাচ্ছন্দ্য আনা যায়।

'বুয়োনা সেরা'—বলে হাতটা আশিসবাবুর দিকে বাড়িয়ে দিল জিওভানি। আশিসবাবু জীবনে এই প্রথম কাউকে দাঁড়িয়ে উঠে জাপানি কায়দায় মাথা ঝুঁকিয়ে 'হ্যালো' বলার সঙ্গে সঙ্গে জিও ফের বলে উঠল,—শুভসন্ধ্যা আশিসবাবু, কেমন লাগছে ইতালি?

এরকম ঝরঝরে বাংলা ওরা আশা করেনি। ওদের হতবাক দেখে লুকাই বুঝিয়ে দিল,—ইতালিয়ান ছাড়াও জিও পৃথিবীতে সবথেকে বেশি প্রচলিত এরকম দশটা ভাষায় স্বচ্ছন্দ। এমনভাবে কথা বলবে বুঝতেই পারবেন না।

পাশের সোফার দিকে আঙুল দেখিয়ে লুকা বলল,—

বস জিও।

তারপর বলল,—জিও কিন্তু যেমনতেমন রোবট নয়। ওর মান অভিমান আছে। রাগ-হিংসা আছে। যে-কোনও কিছু ও খুব দ্রুত শিখে নিতে পারে, খুব জটিল চিন্তা ভাবনাও করতে পারে। ওর ব্রেন ঠিক আমাদের মতো।

—মানে? অনিলিখা অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করে।

—আমি তো তোমাকে জানিয়েছিলাম যে আমি একটা দুর্দান্ত আবিষ্কারের দোরগোড়ায়। আসলে আমি আর্টিফিসিয়াল ব্রেন তৈরির চেষ্টা করছিলাম। এই প্রোজেক্টটা স্টার্ট করেছিলাম পাঁচ বছর আগে। একা অবশ্যই নয়। আমার টিম ছিল। মানুষের ব্রেনের প্রত্যেকটা নিউরোনকে আমি মাইক্রোচিপের সাহায্যে কপি করতে থাকি।

আশিসবাবুর গোল গোল চোখের দিকে তাকিয়ে লুকা বলে ওঠে,—জিও তুমিই ভালো করে বাংলায় বুঝিয়ে বলো। ইংরেজিতে বললে দাদু ভালো বুঝবেন না।

জিও আশিসবাবুর দিকে তাকিয়ে পরিষ্কার বাংলায় বলে ওঠে,—ধরুন, আপনার সামনে কেউ মিষ্টি রাখল।

—মিষ্টি আমি খাই না। ডায়াবেটিক।

—ঠিক আছে পিৎজা দিল। আপনার ব্রেন সঙ্গে সঙ্গে আপনার হাতকে নির্দেশ দিল—আপনি কাঁটা চামচ তুলে নিলেন।

—আমি কাঁটা চামচে খাই না।

—আহ, আশিসবাবু ওকে বলতে দিন না। ও তো উদাহরণ দিচ্ছে।

—যখনই ব্রেন কাজ করে, প্রয়োজনমতো ব্রেনের কিছু অংশ উদ্দীপ্ত হয়। কিছু ইলেকট্রিকাল সিগন্যল তৈরি হয়। সেই একই ইলেকট্রিকাল সিগন্যাল এখানে তৈরি করে মাইক্রোচিপ। এভাবে প্রত্যেকটা নিউরোন একটা আরেকটার সঙ্গে কীভাবে সিগন্যাল বিনিময় করে তা দেখে কৃত্রিমভাবে ব্রেন তৈরি করা হয়েছে। তফাত একটাই। এই আর্টিফিশিয়াল ব্রেনে মানুষের ব্রেনের জায়গায় আছে পঞ্চাশ হাজারটা হাই পাওয়ার কম্পিউটার সার্ভার।

জিও থামতেই লুকা ইংরেজিতে বলে,—সার্ভার রাখতেই আমার ক্যাসেলের বেশিরভাগ জায়গা চলে গেছে। আর ওই সার্ভারগুলোই চালাচ্ছে জিওকে। জিও তাই ঠিক মানুষের মতোই ইনটেলিজেন্ট।

লুকা একটু থামল। কারণ বাড়ির তিনজন পরিচারক-পরিচারিকা সাত-আট রকমের খাবার ট্রলিতে সাজিয়ে ঠেলে নিয়ে আসছে। স্প্যাগেটি, দু-তিন রকমের পিৎজা, স্যালাড। ভারতীয় খাবারও আছে। ভাত রুটি, দুরকম তরকারি, মাংস —নানানরকমের আয়োজন।

—এসব কী করেছ লুকা। এত কিছু খাওয়া সম্ভব? আমি

শুধু পিৎজা খাব। অনিলিখা জানাল।

—সে কী! তোমাদের জন্যই তো ভারতীয় খাবার। ভাবলাম এ ক'দিন ধরে ঘুরছ। ভারতীয় খাবার পাওনি। তা, দাদুর কোনও অসুবিধে নেই তো?

আশিসবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন,—আমার কোনওটাতেই কোনও অসুবিধে নেই। তবে আজ দুপুরে বেশি খাওয়া হয়ে গেছে বলে রাতে কিছু খাব না।

জিও মৃদু হেসে বলে উঠল,—ভয় নেই, খাবারে কোনও বিষ মেশানো নেই।

অনিলিখা আর লুকা তাই শুনে জোরে হেসে উঠল। লুকা বলল,—দেখলে এখানেই জিও স্বতন্ত্র। ও তোমাদের কথাবার্তা থেকে বুঝে যাচ্ছে যে তুমি অন্যরকম কিছু ভাবছ কি না। ঠিক যেমন আমরা ভাবি।

খাবার নিয়ে বাইরে চাঁদের আলোতে বসা হল। ড্রয়িংরুমের লাগোয়া বিশাল ঘাসের লন। লুকার বাড়িটা পাহাড়ের অনেক ওপর দিকে কিন্তু সমুদ্রের ধারে। তাই নীচে পোর্টোফেনির জেটিও দেখা যাচ্ছে। আর দেখা যাচ্ছে জঙ্গলের মধ্যে দূরে দূরে ছড়িয়ে থাকা বাড়িগুলোর আবছা অবয়ব। চারদিক এতটাই নির্জন যে কথা থামলেই দূরে সমুদ্রের ঢেউ-এর আওয়াজ পাওয়া যাচ্ছে। ঝিঁঝির আওয়াজ নির্জনতা যেন আরও বাড়িয়ে তুলেছে।

খেতে খেতে অনিলিখা বলে,—আচ্ছা লুকা, মাঝে তুমি যে লিখেছিলে তুমি নাকি কোনও কিছুতে মনোনিবেশ করতে পারছ না, তা এখন কেমন আছ?

লুকা ওটাকে গুরুত্ব না দিয়ে বলে উঠল,—হ্যাঁ, কিছুদিন ওরকম একটা অসুবিধে হচ্ছিল। এখন নো প্রবলেম।

—তুমি যে টিভিশো হোস্ট করো তা তো জানা ছিল না। জেনুয়াতে দেখলাম।

—কোনটা? 'কে বেশি চালাক'—ওই অনুষ্ঠানের কথা বলছ?

—হ্যাঁ, হঠাৎ জেনুয়াতে হোটেলে দেখলাম। তা তোমার ওতে ইন্টারেস্ট ছিল তা জানা ছিল না তো!

—আইকিউ-এর ব্যাপারটা চিরদিনই আমার ভীষণ ইন্টারেস্টিং লাগে। তাই আমাকে রিকোয়েস্ট করতে আমি রাজি হয়ে গেলাম। জিও-র কিন্তু আইকিউ সাংঘাতিক হাই। করবে নাকি ওর সঙ্গে আইকিউ-এর প্রতিযোগিতা?

এই প্রোপোজালটা অনিলিখার এক্সপেকটেড ছিল না। উৎসাহের সঙ্গে বলে উঠল,—অবশ্যই। তবে শুধু আমি একা কেন, আমার সঙ্গে আশিসবাবুও আছেন। উনিও যোগ দেবেন। কিন্তু আজ থাক। আজ একটু ক্লান্ত। কাল সকালে হবে।

—নিশ্চয়ই, সেটাই ভালো হবে। বলে একটু থেমে

জিও-র দিকে তাকিয়ে লুকা বলল,—বুঝলে জিও, অনিলিখা কিন্তু আমার দেখা সবথেকে বুদ্ধিমান মহিলা, দেখি তোমার আনবিটন রেকর্ড টিকে থাকে কি না!

জিও হেসে মাথা নাড়ল,—অবশ্যই, আমি অনিলিখার সঙ্গে পরীক্ষার অপেক্ষায় থাকব।

—তোমার শোতে যারা জেতে তাদের সবার সঙ্গেই তুমি জিও-র কম্পিটিশন করাও তাই না? অনিলিখা বলে ওঠে।

—কী করে জানলে?—একটু অবাক হয়ে লুকা জিগ্যেস করে।

—না, এমনিই আন্দাজ করলাম। তা ছাড়া তোমার সিঁড়ির বাঁ-সাইডে যে ছবিটা আছে তাতে ওই শো-এর লোগো আঁকা টি-শার্ট পরা কয়েকটা লোকের সঙ্গে তোমার ছবি দেখলাম। মনে হল এখানেই ছবিটা তোলা।

—হ্যাঁ, এখনও পর্যন্ত জিও হারেনি। এদের সঙ্গেও নয়।

—জিও নিশ্চয়ই এদের সঙ্গে প্রতিযোগিতা করতে করতে নিজেকে আরও বুদ্ধিমান করে তুলেছে! ওর আইকিউ আরও বাড়ছে।

—ঠিক তাই। মানুষের ব্রেনের সঙ্গে এখানেই কম্পিউটারের ব্রেনের তফাত। ওরা তাড়াতাড়ি নিজেদের ইমপ্রুভ করতে পারে। মানুষের ব্রেন কীভাবে কাজ করবে, কোন অংশ কীভাবে ব্যবহৃত হবে এসব ঠিক হয়ে যায় তিন-চার বছর

বয়সের মধ্যে। যদি কোনও বাচ্চাকে তিন-চার বছর বয়স অবধি কারুর সঙ্গে মিশতে না দেওয়া হয়, কোনও কিছু শেখানো না হয়—তাহলে সে আর তার পরে কিছুই শিখতে পারে না। আসলে ব্রেনের কোন কোন অংশ ব্যবহার করা হবে—কোনটা হবে না—তা এই বয়সেই স্থির হয়ে যায়। এরকম সাতটা কেস হয়েছে যেখানে বাচ্চাকে সম্পূর্ণ আলাদা করে রাখা হয়েছে—কারুর সঙ্গে মিশতে দেওয়া হয়নি। যখন বাচ্চাটাকে উদ্ধার করা হয়েছে তারপরে আর কিছুই শেখানো যায়নি। আর্টিফিশিয়াল ব্রেন কিন্তু রাতারাতি সার্কিট চেঞ্জ করে নিতে পারে।

—তাহলে তো একদিন এদের সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল হবে। মাংসের ঝোল চাটতে চাটতে আশিসবাবু বলে ওঠেন।

ঠোঁটের কোণে হাসি ফুটে উঠল লুকার। কোনও উত্তর দিল না।

খানিক বাদে ওরা লন থেকে ফের ড্রয়িংরুমে ঢুকে এল। বাইরের লনের আলো নিভে গেল। ঘরে আলো জ্বলে উঠল। এসি চালু হল। দরজা-জানলাগুলো বন্ধ হয়ে গেল। অনিলিখা অবাক হয়ে প্রশ্ন করল,—ঘরের সবকিছুই কি জিও কন্ট্রোল করছে? আলো পাখা, এসি-সব! এমনকী দরজা খোলা-বন্ধও!

লুকা একটু অবাক হয়ে বলল,—কী করে বুঝলে?

—খুব স্বাভাবিক। কোনও সেনসর এত তাড়াতাড়ি এটাকে ধরতে পারত না। এই যে আমরা ঘরে ঢোকার আগের

মুহূর্তেই এসি চলল, আলো জ্বলে উঠল—এসব নিশ্চয়ই কারও নির্দেশে হচ্ছে। তারমানে জিও বাড়ির নেটওয়ার্কে থাকা যে-কোনও জিনিস কন্ট্রোল করতে পারে, তাই না?

—একদম ঠিক। এবাড়ির মাইক্রোয়েভ, ফ্রিজ, জানলার পরদা ওঠানো-নামানো, দরজা খোলা বন্ধ, ভ্যাকুয়াম ক্লিনার চালানো, টেলিফোন রিসিভ—সবই জিও-র নির্দেশে চলে। জিও হল আসল গৃহকর্তা, ঠিক কি না জিও?

জিও ওর টেনিদা মার্কা লম্বা মুখটা ওপর নীচে নাড়িয়ে সায় দিল।

আশিসবাবু মুখটা অনিলিখার কানের কাছে নিয়ে এসে বললেন,—কলকাতায় চাকর-বাকরের যা সমস্যা, আমার এরকম একটি হলে আর কথা ছিল না। তোমার বন্ধুকে এর দাম জিজ্ঞাসা করো তো।

জিগ্যেস করতে হল। না। জিও নিজেই উত্তর দিল,—22 to the power 22 বিলিয়ান ডলার।

থতোমতো খেয়ে আশিসবাবু আর প্রশ্ন করেননি।

বারো

হোটেলে ঢুকেই আশিসবাবু জীবনে এই প্রথমবার কারুর সম্বন্ধে এত উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করে উঠলেন।

—লুকার মতো লোক হয় না। ইতালিতে এরকম জায়গাতেও কী আপ্যায়ন! আর রোবট চাকরটাও বেশ। আমার তো ইচ্ছে করছিল চুরি করে নিয়ে আসি।

—তা চুরি করতেনটা কীভাবে শুনি! ও তো ও বাড়ির দরজাও খুলবে না। বেরোবেন কী করে?

—হঃ, তাও ঠিক। আশিসবাবুর দীর্ঘশ্বাস পড়ল। উনি গুডনাইট বলে ওনার ঘরের দিকে এগিয়ে গেলেন। ভদ্রলোক কোনও কিছুতেই অবাক হন না। আজকে প্রথমবার রীতিমতো অবাক হয়ে গেছেন বলে মনে হল।

অনেক রাত হয়ে গেছে। তবু অনিলিখার ঘুম আসছিল না। হোটেলের ঘরের বাইরে একটা বড় পার্সোনাল ব্যালকনি। ওখানে একটা চেয়ার নিয়ে গিয়ে বসল অনিলিখা। মেঘমুক্ত নীল আকাশ। তাই বিড়লা প্ল্যানেটোরিয়ামে দেখা তারামণ্ডলী নিরাবরণ রূপে চোখের সামনে। ওর মাথায় অনেকগুলো প্রশ্ন। হয়তো, ওর মনের অন্তরালে যে গভীর দুর্ভাবনাটা ঘুরছে, প্রশ্নগুলো উঠে আসছে সেখান থেকেই।

এক, জিও বাংলায় বলছিল, লুকার তা বোঝার কথা নয়, কিন্তু জিও যেখানে কথা শেষ করল, ঠিক সেখানে লুকা স্টার্ট করল কীভাবে? তা হলে কি লুকাও বাংলা জানে?

দুই, লুকার কপালে দেড় ইঞ্চির কাটা দাগটা কীসের? ওই একই রকম দাগ আইকিউ টেস্টের ছেলেগুলোর ছবিতে— অন্তত দুজনের ছবিতে তো ছিলই। একইরকম দাগ ছিল ওই জার্মান ছেলেটার কপালেও।

তিন, লুকা হঠাৎ আইকিউ টেস্ট শো-এর হোস্ট কেন? শুধুই কি বিষয়টাতে আগ্রহ? আর যারা প্রতিযোগিতায় জেতে তাদের কেনই বা বাড়িতে নিয়ে আসে? শুধু জিও-কে আরও শক্তিশালী করে তোলা, না কি অন্য কোনও উদ্দেশ্য?

আরেকটা বিষয় একটু অন্যরকম লেগেছিল। সেটা আশিসবাবুর, 'তাহলে কোনও একদিন এদের সঙ্গে পেরে ওঠা মুশকিল হবে।'—এই মন্তব্যে লুকার ঠোঁটের কোণের বাঁকা হাসিটা? নাহ, ঠিক খেয়াল হচ্ছে না।

কী যেন নাম ওই মৃত সায়েন্টিস্টের? রবার্তো। নিশ্চয়ই সার্চ করলে ওর সম্বন্ধে অনেক তথ্য পাওয়া যাবে। যে মাইক্রোচিপটা দিয়েছিল তারও উদ্দেশ্য বোঝা দরকার।

ঘরের ভেতরে ঢুকে ল্যাপটপ ইন্টারনেটে কানেক্ট করল অনিলিখা। রবার্তোর নামে সার্চ করতেই অনেকগুলো হিট। একটা একটা করে খুলে দেখতে লাগল অনিলিখা। রবার্তো সত্যিই বিপ্লবী সায়েন্টিস্ট। সাতবার নানান জায়গায় বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে, বেশ কয়েকজন মারাও গেছে এ ধরনের বিস্ফোরণে। ওর প্রধান আক্রোশ ছিল কম্পিউটার, রোবট, মাইক্রোচিপ—

এ ধরনের প্রযুক্তিতে। কে জানে কেন? আরও সার্চ করতে ওর লেখা কয়েকটা রিসার্চ পেপার খুঁজে পেল অনিলিখা।

একটা পেপারের নাম, 'সিঙ্গুলারিটি অ্যান্ড ডেঞ্জার অফ ইন্টারকানেক্টেড সিস্টেম'। প্রায় দশবছর আগে চিপ্‌স ম্যাগাজিনে লেখা। তাতে রবার্তো লিখেছেন যে অচিরে কম্পিউটার মানুষের থেকেও বুদ্ধিমান হয়ে যাবে, যা মানবসভ্যতাকে ধ্বংসের মুখে ঠেলে দেবে। আমরা যেমন ইঁদুর-বাঁদর-ষাঁড়- এসব নানান প্রাণীর মস্তিষ্কে মাইক্রোচিপ আর ট্রান্সমিটার ঢুকিয়ে এদের নিয়ন্ত্রণ করি, এরাও তেমনি একদিন আমাদের নিয়ন্ত্রণ করবে। যতদিন যাবে তত আমরা কম্পিউটার-রোবট এসবের ওপর আরও নির্ভরশীল হয়ে উঠে আরও নিজেদের বিপদ ডেকে আনব।

অনিলিখার মনে পড়ে গেল হোসে ডেলগ্যাডোর এক্সপেরিমেন্টটা। একটা ষাঁড়ের ব্রেনে মাইক্রোচিপ ঢুকিয়ে সায়েন্টিস্ট হোসে তার রাগ নিয়ন্ত্রণ করেছিল। যখন ষাঁড় লাল কাপড় দেখে তেড়ে যাচ্ছিল তখন রিমোট দাবিয়ে ওই মাইক্রোচিপ সক্রিয় করে থামিয়ে দিচ্ছিল ষাঁড়কে। একবার নয়, বারবার। তা সে তো বহুবছর আগের কথা। এখন তো মানুষ তার ব্রেনে চিপ বসিয়ে কম্পিউটারের সঙ্গে কথা বলতে পারে। তা লোকে করছেও। দুজন দু-মহাদেশে থেকে কম্পিউটারের মাধ্যমে নিজেদের কানেক্ট করছে। সেই

একইভাবে। ব্রেনের মধ্যে চিপ বসিয়ে।

সব মিলে যাচ্ছে। কপালে কাটা দাগ! হাত ঠান্ডা হয়ে এল অনিলিখার। তাহলে কি লুকা চিপের মাধ্যমে জিও-র সঙ্গে কানেক্টেড? তাই জিও যা ভাবে লুকা তা সঙ্গে সঙ্গে জেনে যায়, আর লুকা যা ভাবে জিও ঠিক তা-ই করে?

উত্তেজনায় ঘরের মধ্যে পায়চারি করতে শুরু করে অনিলিখা। টেনশনটা একটু কমানো দরকার। টিভি চালায়। বেশিরভাগ ইতালিয়ান চ্যানেল অত্যন্ত হালকা চাইপের, স্থূল রুচির। নাচ-গান-টক-শো ফ্যাশন শো। দেখতে দেখতে হঠাৎ লুকার সম্বন্ধে অস্বস্তির অন্য কারণটা খুঁজে পায় অনিলিখা। লুকার ইংরেজি উচ্চারণ এখন ঠিক ইংরেজদের মতো—ইতালিয়ানদের মতো নয়। ওরা ইতালিয়ান উচ্চারণে 'আই' কে 'ই' বলে 'ও' কে 'ইউ'-এর মতো উচ্চারণ করে। কিন্তু লুকার ইংরেজি উচ্চারণে এগুলো ছিল না। আগে তো লুকা এভাবে বলত না। তার মানে কি জিও-ই এখন নিয়ন্ত্রণ করছে লুকাকে? তাই কম্পিউটারের মতো নিখুঁত ইংরেজি উচ্চারণে কথা বলছে লুকা।

মনে পড়ে যায় লুকার পাঠানো দ্বিতীয় মেলটার কথা। লুকা লিখেছিল, কেউ যেন ওর ভাবনা চুরি করে নিচ্ছে। হঠাৎ হঠাৎ করে চিন্তার মোড় ঘুরে যাচ্ছে। তার মানে লুকার প্রথম মেলের ইঙ্গিত যদি হয় নিজেকে একটা অত্যন্ত

শক্তিশালী রোবটের সঙ্গে কানেক্ট করতে পারার ব্যাপারে—তা হলে দ্বিতীয় মেলটা পাঠিয়েছে যখন ওই রোবট বা জিও লুকাকে নিয়ন্ত্রণ করতে শুরু করেছে। কারণ, জিও তো রোজ আরও শক্তিশালী হচ্ছে, আরও ইমপ্রুভ করছে। আর নিজের অজান্তে লুকা আস্তে আস্তে হেরে গেছে ওরই তৈরি রোবটের কাছে! এখন লুকা হল রোবট দ্বারা নিয়ন্ত্রিত একটা মানুষমাত্র—বা বলা যায় আরেকটা রোবট।

তা হলে কি বাকিরাও তাই? ওই কাগজে যাদের নাম লেখা ছিল তারা প্রত্যেকে কি আজ একইভাবে জিও-র দ্বারা পরিচালিত! লুকার মাধ্যমে ওদেরকে ডেকে আনা হয়েছে এখানে। বসানো হয়েছে জিও-র সঙ্গে আইকিউ টেস্টের প্রতিযোগিতায়। এখানে থাকার সময়ে কোনওভাবে অজ্ঞান করে অপারেশন করা হয়েছে। ব্রেনে ঢুকিয়ে দেওয়া হয়েছে মাইক্রোচিপ—যাতে জিও তাদের নিয়ন্ত্রণ করতে পারে।

অনিলিখার মনে পড়ল FAO-এর হেড হোসের কথা, কীরকমভাবে স্থির চোখে কথা বলছিল। আর বিশাল বিশাল নাম্বার একের পর এক বলে যাচ্ছিল। অত সঠিক পরিসংখ্যান একটা সাক্ষাৎকারের সময় কোনও মানুষের পক্ষে বলা সম্ভব! কখনোই না।

কিন্তু একের পর এক মানুষকে নিজের নিয়ন্ত্রণে এনে জিও-র লাভ কী! সমগ্র মানবসভ্যতাকে বিপন্ন করা! তার

জন্য বেছে বেছে নিয়ন্ত্রণে আনা হয়েছে অত্যন্ত প্রতিভাবান লোকেদের। নিয়ন্ত্রণের জাল বিছিয়ে দেওয়া হয়েছে তাবড় তাবড় লোকেদের ওপর। কেউ ব্যাঙ্কের কর্তা, তো কেউ নামকরা সফটওয়্যার কোম্পানির কর্তা। কেউ গভর্নমেন্টের বড় পোস্টে তো কেউ বড় সায়েনটিস্ট। এদের মাধ্যমে ইনফ্লুয়েন্স করার চেষ্টা করা হয়েছে অন্যান্যদের। যারাই পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে তাদের মেরে ফেলা হচ্ছে। যেমন মারা হয়েছে রোমের সেই নিউক্লিয়ার সায়েনটিস্ট ফ্রান্সেসকোকে। আর হয়তো বা কাল ওই লিস্টে অনিলিখার নামও জুড়তে চলেছে।

রবার্তোর কাছে কি এর কোনও সমাধান সূত্র ছিল? ওর দেওয়া চিপটা হাতে নিয়ে অনিলিখা আকাশপাতাল ভাবতে থাকে। এই চিপটা যদি আগে ব্রেনে ইমপ্ল্যান্ট করা হয় তা হলে কি অন্য যে চিপটা জিও ব্রেনে বসানোর প্ল্যান করছে তার কোনও প্রভাব পড়বে না? ইন্টারনেট থেকে পাওয়া রবার্তোর রিসার্চ পেপার পুরোটা পড়া হয়নি। ওটা পড়ে যদি কোনও সূত্র পাওয়া যায়।

ল্যাপটপটা অন করে পেপারটা পড়তে থাকে অনিলিখা। কখন অন্যমনস্ক হয়ে বাঁহাতের তালুতে রাখা চিপটা কি বোর্ডের ওপর রেখেছে তা ও নিজেই খেয়াল করেনি। কিন্তু সেটার জন্য যা হল তা অভাবনীয়। খানিকক্ষণ হতবাক হয়ে

থাকার পর চিপটা আবার যত্ন করে তুলে নিল অনিলিখা। হাতের আঙুল আর আংটির ফাঁকে সাবধানে ঢুকিয়ে রাখল। ধন্য সায়েনটিস্ট রবার্তো।

তেরো

সারারাত ছটফট করে ভোর হতেই উঠে পড়ল অনিলিখা। ব্যালকনিতে গিয়ে দাঁড়াল। ওর আগেই আশিসবাবু উঠে পড়েছেন। নীচে সুইমিংপুলের ডেকে একটা বারমুডা, রংচঙে টি-শার্ট আর গগলস পরে যেভাবে শুয়ে আছেন তাতে ইতালিয়ানরাও লজ্জায় পড়ে যাবে। সূর্য ওঠার আগে গগলস পরার কি দরকার কে জানে! হোটেলের চারধারে প্রচুর লেমন গাছ। থরে থরে লেমন ঝুলছে। চারদিকে বেগুনিরঙা বৌগেনভেলিয়া গাছ, রুপোলি অলিভ গাছ—আরও নাম না জানা কতরকমের গাছ। মাঝে মাঝে দমকা বাতাস গাছের পাতায় খেলা করে যাচ্ছে। হাওয়ার স্রোত সামলে সি গ্যালগুলো উড়ে বেড়াচ্ছে। দূরের পূবের পামগাছগুলোর ওপর কেউ যেন সোনালি রং ছড়িয়ে দিয়েছে। সূর্য উঠছে।

ব্যালকনিতে বেশ খানিকক্ষণ বসে রইল অনিলিখা। তারপর চা-ব্রেকফাস্ট খেয়ে সেলফোন থেকে একটা ফোন

করল। ফ্যাবিওকে। ফ্যাবিওর নাম্বারটা ইন্টারনেটে কাল রাতে পাওয়া গেছে। ফ্যাবিও ইতালির শক্তি দপ্তরের সচিব। ওই কাগজে লেখা নামগুলোর মধ্যে একজন।

উলটোদিকে কেউ একজন ফোনটা ধরেছে। ভারী গলা।

—হ্যালো! হ্যালো!...স্যরি, লাইন ইজ নট ক্লিয়ার, আই কানট হিয়ার ইউ। অনিলিখা শুনেও না শোনার ভান করে।

—আই ক্যান ক্লিয়ারলি হিয়ার ইউ অনিলিখা।

ব্যস, এটুকুই দরকার ছিল। ফোনটা কেটে দিল অনিলিখা। ফ্যাবিওর কোনওভাবেই অনিলিখাকে চেনার কথা নয়। ওর নাম্বারটাও জানার কথা নয়। অনিলিখার অনুমানই ঠিক। এরা সব জিও-র সঙ্গে কানেক্টেড। জিও যা জানে—এরাও তা সঙ্গে সঙ্গে জানছে। ওরাও যা দেখছে বা জানছে, জিও তা সঙ্গে সঙ্গে জেনে যাচ্ছে।

অর্থাৎ, লুকা বা জিও এও হয়তো জানে যে রবার্তো অনিলিখাকে কিছু একটা দিয়ে গেছে। হয়তো সেটার জন্যই ওরা রবার্তোকে খুঁজছিল এবং পরে হত্যা করে।

কিন্তু সবাই তো আর জিও-র কন্ট্রোলে নেই। কেউ না কেউ নিশ্চয়ই আছে যার ওপর জিওর কোনও নিয়ন্ত্রণ নেই। এরকমই কাউকে খুঁজে বের করা দরকার। এরকম মিলিত শক্তির সঙ্গে একা কিছু করা অসম্ভব। আর যদি সম্ভব হয় তা হলে এখান থেকে পালাতে হবে। বাইরে গিয়ে সাহায্য

জোগাড় করতে হবে।

ইন্ডিয়ান এমব্যাসিতে যোগাযোগ করতে পারলে ভালো হত। রোমের ইন্ডিয়ান এমব্যাসির একজনকে খুব ভালো করে চেনে অনিলিখা। তার নাম্বার ডায়াল করার চেষ্টা করে। কিন্তু সেল ফোনের নেটওয়ার্ক পাওয়া যাচ্ছে না। এই তো খানিক আগেই ফোন করল অনিলিখা।

হোটেল রুমের ফোন থেকে ফোন করার চেষ্টা করে অনিলিখা। একটা অদ্ভুত টোন আসছে। বাইরের নাম্বার ডায়াল করা যাচ্ছে না। লুকা আর জিও যে এর পিছনে তা বুঝতে দেরি হল না। যাতে কারুর সঙ্গে যোগাযোগ করা না যায় তার সব ব্যবস্থা ওরা নিয়ে নিয়েছে ক্যাবিওকে ফোন করার পরপরই। কোনওভাবে যদি বাইরের কাউকে মেসেজ পাঠানো যেত।

কথামতো ঠিক দশটায় লুকার পাঠানো গাড়ি এসে গেল। সকাল থেকেই আশিসবাবু যাওয়ার জন্য ছটফট করছিলেন। একবার বললেন,—ব্রেকফাস্টটা তোমার বন্ধুর বাড়িতে সারা যেত।

গাড়িতে যেতে যেতে বললেন,—আমি কিন্তু জিও-র সঙ্গে ওসব আই.কিউ টেস্টে বসছি না। জীবনে করিনি।

—তা কাল তখন আপত্তি করলেন না কেন?

—আহা, অমন পাঁঠার মাংস। আপত্তি করার কোনও

জায়গা ছিল!

খানিকক্ষণের মধ্যেই ওরা লুকার বাড়ি পৌঁছে গেল। আজ ড্রয়িংরুম থেকে একটা প্যাসেজ ধরে ওদের সোজা নিয়ে আসা হল অন্য একটা ঘরে। বিশাল ঘর। হালকা সবুজ একটা আলো জ্বলছে। খানিকক্ষণের মধ্যেই লুকা আর জিও একই সঙ্গে ঘুরে ঢুকল। ইতালিয়ান লোকটা—যে গাড়ি চালিয়ে নিয়ে এসেছিল—সঙ্গে সঙ্গে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

—কেমন আছ অনিলিখা? ভালো ঘুম হয়নি মনে হচ্ছে?

কথার মধ্যেকার ইঙ্গিতটা অগ্রাহ্য করে অনিলিখা বলল,—তা একটু উত্তেজনা হবে না। রোবটের সঙ্গে প্রতিযোগিতা!

—রোবট, রোবট কোরো না, বলো জিও। তোমাদের মধ্যে কে আগে যাবে—তুমি না দাদু?

—আমিই আগে। অনিলিখা বলে,—তবে আমাকে আগে বলো কী কী থাকবে টেস্টে?

—প্রথমেই থাকবে জেনারেল আইকিউ টেস্ট। কিছু পাজল, অঙ্ক, লজিক্যাল রিজনিং, মেমারি টেস্ট, কিছু স্পেশাল এবিলিটি টেস্ট,—যেরকম সাধারণত হয়। তারপর শুরু হবে প্র্যাকটিক্যাল বুদ্ধির পরীক্ষা। ধরো একটা বোতলের মধ্যে ছিপি ঢোকানো আছে। এমন সাইজের ছিপি যে বোতলের মুখটা আর ছিপিটা এক সাইজের। বুদ্ধি করে

বোতল না ভেঙে কোনও কিছুর সাহায্যে ছিপিটা বের করে আনতে হবে। এর পরে হবে মাইন্ড-বডি ইনটেলিজেন্সের টেস্ট। যাকে বলে কাইনেসথেটিক ইনটেলিজেন্স।

—সেটা আবার কী? আশিসবাবু একটু উৎসাহী।

জিও সহজভাবে বাংলায় বোঝানোর চেষ্টা করে,—ধরুন আপনার চোখ বেঁধে দেওয়া হল। এবার আপনাকে একটা বল দেওয়া হল। বলা হল বলটাকে মাটিতে ড্রপ করে ক্যাচ ধরতে হবে। দু-তিনবার আপনার মিস হবেই। কিন্তু তারপরে যার এই ইন্টেলিজেন্স যত বেশি, সে তত তাড়াতাড়ি শিখে নেবে।

—ওই টেস্টটাও কি এ ঘরেই হবে? অনিলিখা বলে।

—না, ওই টেস্টটার জন্য অন্য একটা রুম আছে। এটা তো শুধু একটা উদাহরণ।

অনিলিখা বুঝল যে এই টেস্টের সময়েই কোনওভাবে প্রতিযোগীকে অজ্ঞান করে ব্রেনে চিপ ঢোকানো হয়।

—তা আজকের টেস্ট কে ডিজাইন করেছে, তুমি নাকি? লুকাকে জিগ্যেস করে অনিলিখা।

—না, না আজকের টেস্টে কী থাকবে তা আমি নিজেই জানি না। এর পুরোটাই বোলের করা।

ঘরে ইতিমধ্যেই আরেকজন এসে গেছে। ছোটখাটো চেহারা, টাকমাথা, চওড়া কপাল। মুখচোখে বুদ্ধির দীপ্তি।

গোল ফ্রেমের চশমা। সব থেকে বড় কথা এর কপালে কোনও কাটা দাগ নেই। অর্থাৎ এ লুকা-বা জিও-র দ্বারা পরিচালিত নয়। নিরপেক্ষভাবে প্রতিযোগিতা পরিচালনার জন্য ওর অন্তত একজনকে দরকার যার মনে কী আছে তা জিও যেন আগে থেকে না জানে, অর্থাৎ জিও এই খেলাটা ট্রু-স্পিরিটে খেলে যাতে সত্যিই ওর বুদ্ধির ধার বাড়ে।

বোলে বলল,—আমি কি তাহলে, প্রতিযোগিতা চালু করতে পারি?

—জেনারেল আইকিউ টেস্ট কীরকম হবে আগে একটু দেখাও। অনিলিখা একটু দেরিতে শুরু করার উপায় খোঁজে। ইতিমধ্যে এখান থেকে পালাবার যদি কোনও উপায় বার করা যায়।

—আমি শুরু করব মেমারি টেস্ট দিয়ে। বোলে আশিসবাবুর দিকে তাকিয়ে বলে ওঠে,—আমি কয়েকটা নাম্বার বলছি। আপনি উলটো দিক থেকে পরপর বলুন তো, 5, 9, 10, 3, 6, 7।

আশিসবাবু সোফায় হেলান দিয়ে বসে আরাম করে অ্যাপেল জুস খাচ্ছিলেন। হঠাৎ এরকম প্রশ্নে একটু বিষম খেয়ে বললেন, আমি রেডি নই। আরেকবার বলো তো।

—5, 9, 10, 3, 6, 7 উলটো করে বলুন।

—7, 6 তারপর...বাকিটা ঠিক শুনিনি।

পাশ থেকে জিও খুক খুক করে হাসছে। আশিসবাবু জ্বলন্ত দৃষ্টিতে একবার ওর দিকে তাকালেন।

—[illegible] এটা জাস্ট উদাহরণ ছিল। অ্যাকচুয়াল টেস্টে এরকম হয়তো একশোটা সংখ্যা বলা হবে। এরপর হবে স্পেশাল এবিলিটি টেস্ট। হয়তো কয়েকটা কাঠের ব্লক দিয়ে কোনও একটা নির্দিষ্ট ডিজাইন করতে বলা হল। কে আগে পারে দেখা হবে।

বলে কয়েকটা ব্লক আর একটা ডিজাইন আবার আশিসবাবুর দিকে এগিয়ে দিল বোলে।—এটা একটা অত্যন্ত সোজা ডিজাইন। ক্লাস টু-এর ছেলেরাও পারে। টেস্টের সময় ডিজাইন অনেক বেশি শক্ত হবে। তা আপনি এটা করুন তো!

অনিচ্ছাসত্ত্বেও আশিসবাবু না করে উপায় নেই। বাধ্য হয়ে মিনিটপাঁচেক চেষ্টা করে গেলেন। অনিলিখা বেশ বুঝতে পারছে যে ডিজাইনের কাছাকাছিও কিছু করতে না পেরে উনি রীতিমতো বিরক্ত হয়ে উঠছেন। আসলে ওদের উদ্দেশ্যই বোধ হয় তাই। আশিসবাবুকে উত্তেজিত করে অন্য ঘরে নিয়ে যাওয়া, যাতে অনিলিখা একা থাকে।

হলও তাই। মিনিটপাঁচেক বাদে হঠাৎ ব্লকগুলোকে ছুড়ে ফেলে উঠে দাঁড়ালেন,—নিকুচি করেছে। এটা কোনও আইকিউ টেস্ট হল!

বলে আশিসবাবু আচমকা লুকার মল্লা পেনটা টেবিল থেকে তুলে জিও-কে বলে ওঠেন,—এই পেনটা কি কাজে ব্যবহার করা যেতে পারে বলো!

স্বাভাবিক ভাবেই লুকা, জিও, বোলে একটু হতচকিত। লুকা বলে, 'মানে? এটা আবার কী টেস্ট?

অনিলিখা বলে ওঠে,—অ্যাকচুয়ালি আশিসবাবু একটা ভালো কথা বলেছেন। এটাও আইকিউ টেস্টের পার্ট হওয়া উচিত। একটা লোক যত বেশি ক্রিয়েটিভ হয় সে তত নতুনভাবে কোনও কিছু ভাবতে পারে।

একটু থেমে অনিলিখা আবার বলে,—এখানেই মানুষ রোবটদের থেকে আলাদা। একজন আবিষ্কারক একটা জিনিসকে নতুনভাবে বারবার করার চেষ্টা করে এবং চেনা জিনিসকে নানাভাবে প্রয়োগ করতে পারে বলেই আবিষ্কার করতে পারে। একজন ভালো লেখক নতুন কিছু ভাবতে পারে বলেই ভালো লেখক হয়।

অনিলিখার কথাটা লুকার মনে ধরেছে। বলে,—এক্সেলেন্ট আইডিয়া অনিলিখা। জিও চেষ্টা করো তো!

জিও মাথা চুলকে বলে,—পেন। কালির পেন। কী ইউস হতে পারে? কাগজে লেখা। আর কি? ছবি আঁকা—হ্যাঁ, ছবি আঁকাও যাবে। আর...আর? জিও বোধহয় প্রথমবার এত মুশকিলে পড়েছে।

—আপনার কি মনে হয় আশিসবাবু?

আশিসবাবু সপ্রতিভাবে বলে ওঠেন,—এক, কারুর গায়ে কালি ছেটানো যেতে পারে। দুই, নিব দিয়ে কাউকে আহত করা যেতে পারে।

—দু-একটা ভালো কথাও ভাবুন। অনিলিখা পাশ থেকে বলে।

আশিসবাবু ফের বলে ওঠেন—তিন, পেনের পিছন দিকটা দিয়ে কান চুলকোনো যেতে পারে। চার-পেনের নীচের অংশটা খুলে বা ঢাকাটা খুলে ফুঁ দিয়ে বাঁশির মতো অওয়াজ করা যায়, পাঁচ, ঢাকাটা দিয়ে কোনও তরল ঢালা হয়।

—ব্যস, ব্যস। অনিলিখা আশিসবাবুকে থামিয়ে লুকাকে বলে,—কী দেখলে? এটাই মানুষের স্পেশালিটি। এটা যদি জিও শিখতে পারে তা হলেই জিও পৃথিবীর সবথেকে ইনটেলিজেন্ট প্রাণী হয়ে উঠবে।

জয়ের আনন্দে আশিসবাবু এক চুমুকে বাকি আপেল জুস খেয়ে বলে উঠলেন,—জিও বাড়ি যা!

অনিলিখা ফিসফিস করে আশিসবাবুকে বলে,—জিও কিন্তু মানুষের মতো খেপেও যেতে পারে। ঘুরিয়ে একটা ঘুষি মারলে আমাকে একাই দেশে ফিরতে হবে।

কথাটা শুনে আশিসবাবু থতোমতো খেয়ে একদম চুপ করে গেলেন।

জিও নতুন এই টেস্টটাতে খুব উৎসাহিত। অনিলিখাকে লক্ষ করে বলে,—আরেকটা এরকম দাও তো। চেষ্টা করে দেখি।

অনিলিখা আগেই বাঁ হাতে রবার্তোর দেওয়া মাইক্রোচিপটা রেডি করে রেখেছিল। উঠে জিওর হাতের তালুতে রেখে বলে ওঠে,—বলো তো এটার কী কী ইউস হতে পারে?

—কম্পিউটার তৈরি, কম্পিউটার তৈরি, কম্-পিউ-টা...র তৈ-কম্—। জিওর কথা জড়িয়ে যাচ্ছে। খানিকবাদে থেমে গেল। যেভাবে দাঁড়িয়েছিল সেভাবেই দুবার কেঁপে উঠে পুরো স্থির হয়ে গেল। চোখের পাতা স্থির-বিস্ফারিত। হাতটা সামনের দিকে একইভাবে বাড়ানো।

ঘটনার আকস্মিকতায় বোলে অবাক।

লুকা যেন ঘুম থেকে জেগে উঠেছে। আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াল। তারপর এগিয়ে গেল জিওর দিকে। একটা প্রচণ্ড ধাক্কা দিল জিওকে। জিওর স্থির শরীরটা আওয়াজ করে ছিটকে পড়ল কার্পেটের ওপর। তারপর লুকা ছুটে গিয়ে অনিলিখার হাত দুটো ধরে ইতালিয়ান উচ্চারণে ইংরেজিতে বলে উঠল,—অনেক অনেক ধন্যবাদ অনিলিখা। তুমি আমাকে নতুন জীবন দিলে। গত দু-মাস ওই রোবটটা আমার জীবনের সব অধিকার কেড়ে নিয়েছিল। আমার শুধু ভুল হয়েছিল মাইক্রোচিপ বসিয়ে ওর ব্রেনের সঙ্গে কানেক্ট করা। প্রথমদিকে

ঠিক ছিল। বড় বড় গুণ ভাগ ওর সাহায্যে মুহূর্তের মধ্যে করতে পারতাম। যা পড়তাম-শুনতাম সব মনে রাখতে পারতাম। কিন্তু তারপর একদিন—।

লুকা এবার সোফায় বসে পড়ে খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে বলে,—হ্যাঁ, যা বলছিলাম। ঘটনাটা দুঃস্বপ্নের মতো, হঠাৎ মনে হল কে যেন আমাকে আমার মতো ভাবতে দিচ্ছে না, আমার মতো করে কোনও কিছু করতে দিচ্ছে না। ভাবছি খেতে যাব, হঠাৎ মনের মধ্যে কে যেন আমাকে বলছে ভিডিয়ো গেমস খেলতে, আর আমাকে রীতিমতো টেনে নিয়ে যাচ্ছে সেদিকে। প্রথমদিকে কিছুদিন তাও মনের জোরে ওই রকম নির্দেশকে কাটানোর চেষ্টা করতাম। কিন্তু তারপর আর সে ক্ষমতাও রইল না। যা নির্দেশ আসে, তাই করি। ব্যবসার সূত্রে ও কর্মসূত্রে আমার নাম সবার কাছেই পরিচিত। পুরো ইউরোপের শীর্ষমহলে আমার মাধ্যমে ইনফ্লুয়েন্স খাটাতে শুরু করল জিও।

—বাকিটা আমার জানা লুকা। কীভাবে একটা রোবট একের পর এক ক্ষমতাশালী লোককে নিজের কবজায় এনে আরেকটা রোমান সাম্রাজ্য গড়তে চেয়েছিল তা না দেখলে বিশ্বাস হত না। তবে রবার্তো সাহায্য না করলে আমার পক্ষে কিছুই করা সম্ভব হত না। গত পনেরো বছর ধরে ওই সম্ভাবনার কথা মাথায় রেখেই ও সাধনা চালিয়ে

যাচ্ছিল, যাতে যন্ত্র কখনওই মানুষের ওপর রাজত্ব না করতে পারে। ও নিশ্চয়ই জানতে পেরেছিল যে আমি এখানে আসছি। তাই পুলিশ, জিও এবং জিও-র দ্বারা নিয়ন্ত্রিত সমাজের চোখ এড়িয়ে কোনওভাবে মাইক্রোচিপটা আমাকে পৌঁছে দিয়েছিল।

—কী ছিল ওতে?

—ভাইরাস, এক ধরনের কম্পিউটার ভাইরাস, যা মুহূর্তের মধ্যে কম্পিউটারের হার্ডওয়্যারকে খারাপ করে দেয়। কীভাবে ও ওটা প্রোগ্রাম করেছে তা অবশ্য অনেক খতিয়ে দেখতে হবে। আমাদের এখন কয়েকটা ফোন করতে হবে। দেখতে হবে বাকিরাও রোবটের নিয়ন্ত্রণ থেকে বেরিয়ে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে—

'মা-মা-মার্ডারার'—হঠাৎ আশিসবাবুকে তোতলাতে দেখে অনিলিখা কথা থামিয়ে ওনার দৃষ্টিপথ অনুসরণ করে দরজার দিকে তাকায়। তাকিয়েই চমকে ওঠে।

দরজার কাছে সেই বিশালদেহী জার্মান ছেলেটা। ডান হাতে একটা বন্দুক। এই ছেলেটাকেই রোমে-ভেনিসে দেখেছিল অনিলিখারা। খুব সম্ভবত রবার্তোকে এই ছেলেটাই মেরেছে।

'বস, বস-ম্যারিও।'—বলে লুকা ছেলেটাকে সোফায় বসতে বলে। তারপর উঠে গিয়ে ছেলেটার হাত থেকে

বন্দুক কেড়ে নিয়ে দূরে ছুড়ে ফেলে বলে ওঠে, 'ম্যারিওর কোনও দোষ নেই। ওর মতো নিরীহ ছেলে খুব কম হয়। ওকে জিও নিজের কন্ট্রোলে নিয়ে আসে। তারপর ভাড়াটে খুনির মতো ব্যবহার করে। ওকে দিয়ে জিও-ই রবার্তোকে মারে। ফ্রান্সেসকোকে হত্যা করে। তোমাদেরকেও আজ ওরই হাতে মরতে হত।'

বলে একটু থেমে ফের প্রশ্ন করে, 'ম্যারিও, এখন স্বাভাবিক বোধ করছ তো?'

ম্যারিও সোফায় বসে মুখ ঢেকে ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে। ডান হাতটা বাঁ-হাত দিয়ে চেপে ধরে বলতে থাকে, 'এই-এই হাতে আমি রবার্তোকে গুলি করেছি, হা ঈশ্বর! রবার্তোর মতো মহান সায়েন্টিস্টকে!

মিহি গলায় আশিসবাবু বাংলায় সান্ত্বনা দেন, 'বাবা, দু-একটা ভালো কাজও করেছ। এক ইউরোতে আমাকে অমন ভালো ছাতা গিফ্‌ট!'

চোদ্দো

জেনুয়া এয়ারপোর্ট। সমুদ্রের ধারে ছোট্ট এয়ারপোর্ট। অনিলিখাদের এয়ারপোর্টে ছাড়তে এসেছে লুকা, বিখ্যাত

ইতালিয়ান ব্যাঙ্ক 'ইনটেসা স্যানপাওলো'-র হেড পাওলো ও আরও কয়েকজন। গাড়ি থেকে নেমে এয়ারপোর্টের টার্মিনালের ভেতরে ঢুকেই আশিসবাবু ফ্লাইট নাম্বার, চেক ইন গেট দেখতে চলে গেছেন। দু-তিন মিনিট বাদে হন্তদন্ত হয়ে ফিরে এলেন। বললেন,—চাও লুকা। চাও পাওলো। এবার আমাদের চেকইনের লাইনে যেতে হবে। তোমাদের সঙ্গে এতদিন দারুণ কেটেছে।

অনিলিখারা পোর্টোফেনিতে তিনদিন এক্সট্রা ছিল। হোটেল ভাড়া—অন্যান্য যাবতীয় খরচ লুকা জোর করে দিয়ে দিয়েছে। এমনকী ফেরার ইকনমি ক্লাস টিকিট ক্যানসেল করে দুটো ফার্স্টক্লাস টিকিটও কিনে দিয়েছে। অনিলিখার কোনওরকম প্রতিবাদে কর্ণপাত করেনি। এ ছাড়া জোর করে দিয়েছে হাজারো গিফট—দামি দামি ব্রান্ডের পোশাক, ঘড়ি। তার একটা প্রমাণ আশিসবাবুর পায়ে, যিনি ফুটপাথের কেনা চটি ছাড়া পরেন না, তিনি আজ পঞ্চাশ হাজার টাকা দামের প্রাদার বুট পরে কায়দা করে ঘুরছেন।

বিদায় বেলায় লুকা হঠাৎ বলে উঠল,—আশিসবাবুকে লাস্ট একটা গিফট দেওয়া আমার বাকি আছে।—বোলে—!

বোলে আর ওর সঙ্গে আরও দুজন গাড়ির ডিকি থেকে একটা বড় বাক্স ধরাধরি করে নামাতে শুরু করল।—কী

ওটা? অনিলিখা বলে,—এত গিফট। না, না আর কিছু নয় প্লিজ।

আশিসবাবু ফিসফিস করে অনিলিখাকে বলে ওঠেন,—ফ্রি-তে যা পাবে সব নিতে হয়, বুঝেছ?

বলে পরম উৎসাহের সঙ্গে জোরে বলে ওঠেন,—গ্র্যাৎসি মিলে, তা ওটাতে কী আছে?

ভদ্রলোক এখন রাতারাতি ইতালিয়ান বেশি বলছেন।

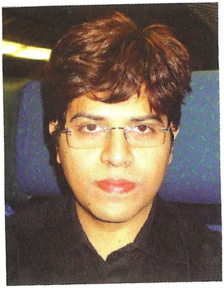
—'জিও।' আপনি চেয়েছিলেন না? তাই ভাবলাম, বাড়িতে সাজিয়ে রাখবেন। আমার আর কী দরকার? উলটে দেখলেই ভয় লাগবে।

—না! নো! -নেহি!—নে! চারটে ভাষায় 'না' টা এত জোরে আশিসবাবু বললেন যে এয়ারপোর্টের ভেতর থেকে নীল পোশাক পরা একটা পুলিশ ছুটে বাইরে বেরিয়ে এল।

একটু সামলে আশিসবাবু বললেন,—চলো অনিলিখা। এবার এগোতে হবে। ফ্লাইট ছাড়তে আর ঠিক একঘণ্টা তিপ্পান্ন মিনিট বাকি আছে। আমাদের ফ্লাইটটা গেট নাম্বার 7-এ। তার আগে বারোটা ফ্লাইট আছে। জ্যুরিখ যাচ্ছে ফ্লাইট A1907—4 : 05-এ গেট 31। নিস যাচ্ছে ফ্লাইট A2233—4 : 09-এ গেট 8। ফ্রাঙ্কফুর্ট যাচ্ছে ফ্লাইট বি 2109—4 : 22-এ গেট 4...।

আশিসবাবু লুকা আর অনিলিখার বিস্ফারিত চোখের সামনে বারোটা ফ্লাইটের ডিটেলস বলে গেলেন। তারপরে সবাইকে চুপ দেখে ইতালিয়ান কায়দায় মাথার টুপিটাকে ডান হাতে মাথা থেকে আধফুট তুলে বললেন,—অ্যারেবিদার্চি অ্যা প্রেস্টো। অর্থাৎ 'বিদায়! আবার দেখা হবে।'





জন্ম ১৮ এপ্রিল ১৯৭০, কলকাতায়। হিন্দু স্কুল থেকে মাধ্যমিকে, উচ্চমাধ্যমিকে প্রথম দিকে স্থানাধিকার। পরে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইলেকট্রিকাল ইঞ্জিনিয়ারিং ও আইআইএম কলকাতা থেকে অপারেশনস ম্যানেজমেন্ট নিয়ে পড়শোনা। বর্তমানে উচ্চপদে কর্মরত। কর্মসূত্রে আমেরিকা, ইংল্যান্ড, আয়ারল্যান্ড ও ইউরোপ...নানা দেশে দীর্ঘদিন থেকেছেন।

লেখালেখির শুরু ১৯৯৪-এ কিশোর ভারতী ও আনন্দমেলার পাতায়। লেখার বিষয় প্রধানত বিজ্ঞান, কল্পবিজ্ঞান, রহস্য। বাংলায় প্রকাশিত গ্রন্থ ঃ **গেলাবাল ওয়ার্মিং, সংকেত রহস্য, কেমন করে কাজ করে যন্ত্র, দেশবিদেশের সেরা কল্পবিজ্ঞান, সারা বিশ্বের সেরা রূপকথা, এই পৃথিবী একশো বছর পরে** ইত্যাদি।

নেশা কল্পবিজ্ঞান ও রহস্যকাহিনি লেখালেখি, বিজ্ঞান চর্চা ও ব্যাডমিন্টন খেলা।

প্রচ্ছদ **রাজীব পাল**

রহস্য যখন ডারউইন

ডারউইনের ডায়েরি
থেকে আবিষ্কৃত অজানা
দ্বীপে অনিলিখা!...
ইতালিতে বিখ্যাত
মানুষেরা নিরুদ্দেশ!...

একমলাটে দুটি রুদ্ধশ্বাস
সায়েন্স অ্যাডভেঞ্চার।



INR 120.00

9788183741415

www.bookspatrabharati.com